সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী
ও অন্যান্য

সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

অধুনা

SAMABETA PRATIDWANDWI O ANYANYA

by SANDIPAN CHATTOPADHAYAY

A Collection Of Stories

প্রথম প্রকাশ ॥ জুলাই ১৯৬১

প্রকাশক ॥ কৃষ্ণগোপাল মল্লিক। অধুনা। ১৭/১ডি সূর্য সেন স্ট্রীট কলকাতা ১২

মুদ্রণ ॥ ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস। ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ ॥ গৌতম রায় ব্লক ॥ দি স্টেটসম্যান লিঃ

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ॥ অভ্যুদয় প্রেস প্রাঃ লিঃ বাঁধাই ॥ বি শর্ম্মা বুক বাইণ্ডার্স

তৃনা (৪)

বইটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফ্যালো

ছোটগল্প ও কবিতা কাছাকাছি চলে আসছে নাকি? আমি খবর রাখি না। স্টেটস্‌ম্যান পড়া আমি ছেড়ে দিয়েছি।

বিজনের রক্তমাংস থেকে আমি কোনো গল্প লিখিনি। অনেকেরই লেখা পড়েছি। কিন্তু আমি কারো, কোনো, কখনো, গল্প পড়িনি। একদিন ভোরবেলা বেসিনে রক্তবমি করছি দেখে ২।১ মাসের মধ্যেই আমি বিজনের রক্তমাংস লিখতে বসে যাই, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী লিখি একটা মেয়েকে নিয়ে, পুরীতেই চেনা হয়েছিল, তার নামও ছিল মায়া। হুবহু ঐ-রকম ঘটেছিল। ঐ ভাষায়। আমার পিশতুতো দাদার নাম ছিল বিশ্বনাথ, মীরাবাঈ-এর বিশেদা, একদিন জালের ধারে ওদের ঐ অবস্থায় দেখেছিলুম। একবার একটা মেয়ে দেখতে গিয়েছিলুম, সেই নিয়ে লিখেছিলুম দশ বছর পরে একদিন, বদ্যিবাটিকে শ্রীরামপুর ও শকুন্তলাকে মনিমালা করার অপরাধে ওটা যদি গল্প হয়ে গিয়ে থাকে.

মনে করি কিছুটা হয়েছেও, তাহলে ও রকম আর কখনো করব না। উৎপল সম্পর্কে বা চাইবাসা-চাইবাসা গল্পে করিনি।

অতএব, আমার লেখা, যা আদৌ গল্প নয়, তা কেন ও কী উপায়ে তার কাছাকাছি চলে যাবে, যার কোনো অস্তিত্ব নেই! যা কবিতা?

তা ছাড়া কোনটা গদ্য কোনটা পদ্য, বুঝব কী করে, এ কি সম্ভব নাকি বোঝা কোনটা কী! ছেলেবেলা থেকে রূপনারাণের কূলে আমি প্রোজ হিশেবে পড়ে আসছি, জীবনানন্দের সুদীর্ঘ কবিতাগুলো আমাদের সকলেরই মনে হয় উপন্যাস, সমুদ্র ও বাতাসের বিরুদ্ধে লাল বলের ওপর এক-পা তুলে সরু কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে বালক টাডজিউ—"এর চেয়ে বেশি কবিতা কখনো পড়িনি", এ-কথা আমাকে এক কবির বাবা বলেছিলেন।

সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী

আ শা ল তা

আমি চাইবাসার মেয়ে। আমরা সাত বোন, এক ভাই। আমি বাবার ন'মেয়ে। বড়দিকে কোলে নিয়ে বাবার সঙ্গে মা এসেছিলেন এখানে, সে অনেক বছর আগের কথা। বাবা এসেছিলেন কাঠের ব্যবসা করতে, এখন রুঙ্‌টার গুদামে কাজ করছেন। যাকগে সে কথা। সে অনেক বছর আগের কথা।

আমার বড়দি প্রেম করে বিয়ে করেন। সত্যময়দা এদিককারই ছেলে, টাটায় কাজ করতেন, মাসিমার বাড়িতে ওদের আলাপ হয়েছিল। তারপর তাঁর আসা-যাওয়া শুরু হয়। সত্যময়দার মত রূপবান আমি কখনো দেখিনি, দিদি রূপে মজেছিল। তখন আমি আর দিদির কোলে উঠি না।

ক্রমে আমরা জানতে পারি সত্যময়দা চরিত্রহীন ও চোর, পরে তাঁর জেল হয়েছিল। দিদি টাটায় থাকতে পারত না, কোলেরটা নিয়ে পালিয়ে আসত। রাত্রে বিছানায় পিঠের ছিপটির দাগে দিদি হাত বুলিয়ে দিতে বলত আমায়, বলত, 'বাবাকে বলিস না যেন, বুঝলি।' দিদির প্রথম ছেলেটা পেটেই মারা যায়। দ্বিতীয়বার একটা রক্তমাংসের ডেলা জন্মাল সাত মাসে, দিদির মাথায় চুল উঠে যেতে লাগল, ক্রমে দিদির মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা গেল। দিদি পাগল হয়ে গেল। টাটা

থেকে দিদির চিঠি আসে না আর, ওরা ওখানে নেই, জানিনা বেগম কেমন আছে, টুটু কত বড হল। নারীর মত রূপবান ও আয়তচক্ষু সত্যময়দাকে বেশ মনে পড়ে।

চুনীদা এখন রাউরকেলায়, আমার মেজ জামাইবাবু। মেজদিকেও প্রেম করতে হয়েছিল, নইলে ডাক্তার-পাত্র জুটবে কী করে। কিন্তু আমি তখন আর একটু বড হয়েছি, আমি জানি ডাক্তার বলে দিদি চুনীদাকে প্রেমে পড়ায় নি। চুনীদার মত স্বাস্থ্যবান ছেলে বাঙালির ঘরে কমই দেখা যায়, তার মত কুৎসিত আমি এখনো দেখিনি। সবচেয়ে যা কল্পনাতীত, চুনীদা জানত সে কী কুৎসিত। এ-বিষয়ে যা জানার চুনীদা সবই জেনেছিল। আমি জানি মেজদি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারেনি, মেজদি নিজেই ঐ সুঠাম ও কুৎসিত পুরুষের প্রেমে পড়েছিল। মেজদির বিবাহিত জীবন আজো খুবই ব্যস্ততায় কাটছে। দুরারোগ্য মেয়েদের অসুখে ভুগে ভুগে মেজদি মারা যাচ্ছে, তবু আট বছরে এই নিয়ে সপ্তমবার তাকে গর্ভবতী হতে হল।

ছেলেবেলাতেই আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারি যে, আমাকেও প্রেম করতে হবে। আমি এবার ফ্রক ছাডব, আমার পরের বোন পরবে আরো বছরতিনেক। সেও জানে।

আমি লেখাপড়ায় ভাল ছিলাম। বড় বেশি ভাল ছিলাম, তবু ক্লাস সেভেনে উঠে আমায় পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। বাস্তবিক, আমাদের বাইরের ঘরে হার্মোনিয়ম ছিল ; ফুলদানিতে ছিল কাগজের ফুল, কেউ এলে পরে বের হবার মত জামাকাপড় আমাদের সবসময় ছিল। আমরা বরাবর চুলে তেল মাখতে পেয়েছি, আর্শির নিচে সামান্য টয়লেট-এর অভাব হয়নি কোনোদিন। কিন্তু কী করে যে দু'থালা ভাত পেতাম রোজ, তা আজো বুঝি না। সে যাই হোক, এই সময়েই সমীরণদা পাটনা থেকে বদলি হয়ে এল চাইবাসায়। বাবার সঙ্গে আলাপ হয় রাস্তায়। তখন আমি বাড়িতে বসে আছি। বিকেলের

দিকে সমীরণদা অফিসফেরৎ সোজা আমাদের বাসায় চলে আসা শুরু করলে, সেজদি আমাকে বলল, 'আশা, তুই এবার স্কুলে ভর্তি হ।' সমীরণদার একটা পা ছিল ছোট, সমীরণদাই শশাঙ্কবাবুকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসে।

তার আগে আমাদের বৈঠকখানায় সমীরণদার মুখে শশাঙ্কবাবুর গল্প অনেক শুনেছি। গল্প কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে, 'আজ শশাঙ্কর একটা চিঠি পেলাম মাসিমা', 'শশাঙ্ক আসবে বলেছে', 'শশাঙ্কর বাবার স্ট্রোক হয়েছিল মাসিমা, মারা গেলেন'। একবার পুজোর আগে শশাঙ্কবাবু সত্যিই এসে হাজির হলেন। 'শশাঙ্ক এসেছে মাসিমা, বিকেলে নিয়ে আসব।' ভোরবেলা সাইকেলে করে এসে হন্তদন্ত সমীরণদা মাকে বলে গেল। তখন আমি ক্লাস এইট-এ পড়ি।

বিকেলে আমরা সকলেই তৈরি হলাম। ফুলের ধুলো মোছা হল, কলাপাতা-রঙের জর্জেটটা সেদিন সেজদি পরল। সেজদি বাদে আমরা সকলেই বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম, রাস্তার মোড় থেকে ওঁরা বাড়ি অব্দি পৌঁছবার আগেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল, আমরা দেখলাম ব্যস্ততাহীন মন্থর পায়ে হেঁটে আসছেন সমীরণদার বন্ধু, সমীরণদা আসছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে, তাঁর দিকে মুখ তুলে কথা বলতে বলতে।

হ্যারিকেনের আলোয় এই প্রথম আমরা কলকাতার লোক দেখলাম। একে একে সকলের সঙ্গেই তাঁর আলাপ হল। শশাঙ্কবাবু মাকে প্রণাম করলেন পা ছুঁয়ে, বাবাকে হাত তুলে নমস্কার করলেন। ওইটুকু ঘরে এত লোক আঁটে না, বাবা পাশের ঘরে চলে গেলেন। সেজদি চা করে আনল। হার্মোনিয়মের সঙ্গে সেজদি একটা গান গেয়েছিল সেদিন, 'বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছো, কেমনে দিই ফাঁকি...।' 'ফাঁকি' শব্দটার ওপর এমন অদ্ভুতভাবে সুর ফ্যালে সেজদি যে, বরাবরই আমার হাসি পায়, তখন ওর মুখ দেখলে মনে হয় যেন ফাঁকি দিতে না পেরে বেচারা বড় মুশকিলে পড়ে গেছে। সেদিন অতিকষ্টে হাসিনি।

আমি নিজে গাইতাম পরের লাইনটা, ভালবাসতাম একা গাইতে। তখন ভয় হত। কে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে আসছে, আমার মনে হত, আমি তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। 'আধেক ধরা পড়েছি গো', তার নাগালের বাইরে দূরে, দুষ্টুর মত ঘুরে ঘুরে আমি কেবলি গাইতাম, 'আধেক আছে বাকি।' তখন আমার চোখের তারা কালো হচ্ছে দিনে দিনে, চোখের পাতা বড় হচ্ছে। রক্তলাগা ছুরির মত কী পাৎলা ছিল তখন আমার নিচেব ঠোঁট, হাসলে কী অসম্ভব চওড়া হয়ে যেত, জিভ দিয়ে দু'আঙুলে টিপে ধরেছি কতদিন।

পরদিন সমীরণদারা রাঁচি-চক্রধরপুর রোডের ওপর টেবো বলে একটা জায়গায় বেডাতে গেলেন। চক্রধরপুর থেকে রাঁচি যাবার পথে চব্বিশ মাইল পাহাড়েব রেঞ্জ পেরোতে হয়। শেষের দিকে পড়ে জায়গাটা। কাছাকাছি পাহাডের ওপর একটা ডাকবাঙলোয় ওঁরা দিনকয়েক থাকবেন। রাজাখার্সোয়াং দিয়ে শশাঙ্কবাবু ফিরে যাবেন কলকাতা।

তিনদিন আমরা টেবো হিল-এর দিকে চেয়ে রইলাম, মেঘ জেগে উঠতে দেখলাম তার পিছন থেকে, উপত্যকার উপর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়তে দেখলাম। টেবো যাবার অন্ধকার পথ জুড়ে চাঁদ উঠতে লাগল রোজই। পূর্ণিমার চাঁদ টেবোর পথরোধ করে দাঁড়াল।

দিন চারেক পরে সমীরণদা ফিরে এল। 'শশাঙ্ক থেকে গেল মাসিমা,' সমীরণদা মাকে জানাল।

গোটা শীতকালটা শশাঙ্কবাবু থেকে গেলেন। সমীরণদা থাকত নিমডিতে, ওখান থেকে বড়িবাজার দিয়ে আমাদের বাড়ি পৌঁছতে লাগে আধঘণ্টা, সমীরণদার কোয়ার্টারের পিছনেই একটা প্রকাণ্ড মাঠ ভেঙে নদী পেরিয়ে এলে লাগে দশ মিনিট। মাঠ দিয়ে শশাঙ্কবাবু আগে আসেন নি। আমরাও আসি না। শ্মশানে তখন চিতা জ্বলছিল,

হল্কায় দপদপিয়ে উঠছিল দেবদারু গাছটা, রোরো-র শব্দ শুনে মনে হয়, যেন তা তলা দিয়ে বইছে, মাটি ভেঙে কাছে এগিয়ে আসছে।

তখনো তেমন শীত পড়েনি। সরীসৃপহীন নির্জন মাঠের মাঝামাঝি পৌঁছে, আমি শশাঙ্কবাবুর গা ঘেঁসে হাঁটছিলাম, আমার গায়ে ছিল একটা ছাইরঙের কাটফ্রক। যেন অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, একটা সিগারেট ধরাবার সময় শশাঙ্কবাবুর হাত আমার খোলা কাঁধে লেগে যায়।

তারপর আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার নগ্ন কাঁধের ওপর নোখসুদ্ধ তাঁর নগ্ন হাত চেপে বসে যাচ্ছে ক্রমশ ঘাড়ের কাছ দিয়ে তালু ঘুরিয়ে এনে তিনি আমার এলোচুলের গোছা এত জোরে চেপে ধরলেন যে আমার চোখে জল এসে গেল। তাঁর ডান হাতে দেশলাই কাঠিটা সম্পূর্ণ জ্বলে ফেলে আমি দেখলাম, তাঁর চোয়াল নড়ছে, এই টলে-পড়া অন্ধকারে শুধু তাঁর মুখটুকুই নিষ্কাশিত পাথরের মত একমাত্র শাদা। চুল তুলে হাত বুলিয়ে তিনি আমার খোলা পিঠ দেখলেন, চুলের গোছা ধরে তাঁর মুখের কাছে টেনে নিয়ে গেলেন আমার মুখ, তাঁর অবিরল চাহনি আমার বুকের ভিতরে গিয়ে পড়তে লাগল। সত্যিই আমার শরীরময় কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, দুই হাতে আমার মুখ তুলে ধরে যখন শশাঙ্কবাবু আমাকে···

তখন শশাঙ্কবাবুর বয়স ৩৮। তখনো আমার বয়স হয়নি।

শ শা ঙ্ক

আমি সবকিছুই জেনেছিলুম। কেবল একটি বিষয়ে আমার জানার বাকি ছিল। তারই জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলুম, এমন সময় গোপালের সঙ্গে আমার দেখা হল।

কলেজে আমার প্রথম আলাপ হয় অমূল্যর সঙ্গে। কলেজেই তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমে ওঠে, ইউনিভার্সিটিতে দীপান্বিতা বসুর সঙ্গে প্রেম করতে করতে আমার চোখের সামনে তার ঘাড় গর্দান হয়ে যায়। আগে ছিল দাদা, আমার ফ্রেণ্ড ও বিধবার গদাই, এখন দু'টি-তিনটির বাবা, হাজবণ্ড ও বাঙলার অধ্যাপক। এখন ক্লাসে বলে, 'ইউ, জানো হে, এরিউডিশন কথাটার বাঙলা কী ভুলে গেছি. হেঃ, হেঃ, হেঃ,' হাস্য করে।

নির্বোধতম সে আজো আমার বন্ধু, আজ আমার প্রকৃত ও একমাত্র বন্ধু। মনে পড়ে আলাপের প্রথম দিনেই ওয়াই. এম. সি. এ. রেস্তোরাঁর মোগলাই পরটা খেয়ে কথাপ্রসঙ্গে অমূল্য আমাকে বলেছিল, 'ভেবে দেখেছেন, জীবনের তিনভাগের একভাগ আমরা ঘুমিয়ে কাটাব ?' উইট মাঠে মারা যাচ্ছে দেখে মনঃক্ষুণ্ণ অমূল্য ব্যাখ্যা করে বলেছিল, 'মানে প্রতিদিনই আট ঘণ্টা করে ঘুমুতে হবে তো রোজ ?' কথাটা সেদিন বলামাত্রই কেন বুঝতে পারিনি, আজ বুঝি। যদিও অনিদ্রারোগে আমি ভুগছি মাত্র বছরপাঁচেক, তখন ভালই ঘুম হত, তবু বুঝতে পারিনি। মনে হয়, সেই মুহূর্ত থেকেই আমার মনে জেগে থাকার বোধ জেগে ওঠে, মাত্র ১৮।১৯ বছর বয়সেই আমি পুরো বুঝতে পারি যে, আমি জেগে আছি এবং আমি জেগে থাকতে চাই। নিতান্ত তরুণ বয়সেই আমি সংকল্প করি ও আমাকে প্রতিশ্রুতি দিই, 'আমার যা কিছু ঘুমিয়ে, সে সবই একে একে জাগিয়ে আমি জেগে থাকব।' আমি ঘুমে বা ঘুমঘোরে কাটাতে চাইনি। এইজন্যেই আমি বিকেল থেকে পর্যায়ক্রমে ও জ্ঞাতসারে অন্ধকার হয়ে যেতে দেখেছি প্রতিদিন। গান শোনা শেষ করে, কারো সঙ্গে কথা বলতে বলতে বা ঠোঁট থেকে ঠোঁট তুলে নিয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সহসা-অন্ধকার আমি কখনো দেখিনি। অপ্রত্যাশিত ঘটেনি কিছুই।

ঠিকই বলেছিল অমূল্য, বাস্তবিক আজ বিশ্বাস আছে কেবল স্টুপিড

ও প্রফেটের, এ ছাড়া কার? [অমানুষিক শরীর-কাঁদানোর পর, চিন্তা থেকে চৈতন্যে পৌঁছে কেউ কেউ প্রফেট হয়, কিন্তু স্টুপিড কত আগে থেকেই সেই আরব্ধ লক্ষ্যে বসে আছে।] রেস্তোরাঁর কেবিনে ওয়াইল্ড উডবাইনের ধোঁয়ার ভেতর থেকে অমূল্যর মুখের মাংস ভেসে আসে।

২০ থেকে ২৫ এই ক'বছর আমার কিছু অপেক্ষা ছিল। এই ক'বছরেই আমি এ-বিষয়ে সচেতন হই যে, আমার জীবনে কোনো ঘটনা ঘটছে না। মানুষের জীবনে আর কিছুই হবার নেই। যা যা হবার সবই হয়ে গিয়েছে বলে আমার জীবনেও আর কোনো ঘটনা ঘটবে না, এই নির্ভুল ধারণা আমার জন্মায়। ইংরেজিতে আজকাল একটা নতুন শব্দ উঠেছে। আমি ছিলুম এ্যামবিভার্ট-ধরনের। আমি এখানেও ছিলুম, সেখানেও ছিলুম, এ নয় যে আমি কোনোখানেই থাকিনি। যেমন মেয়েমানুষকে আমি যে ভালবাসতে পারিনি বা ঘৃণা করে দেখিনি তা নয়; কিন্তু তারা হয় কাছে এসেছে, নইলে ঘৃণা করেছে। আমি ছিলুম এ্যামবিভার্ট। আমি ভালবাসাতেও ছিলুম ঘৃণাও করেছি। পারফেকশান-সম্পর্কে আমার একটা আলাদা থিওরি ছিল। যে কোনো কাজের চেয়ে তার চিন্তা আমি বেশি বাস্তব বলে ভেবেছিলুম। কেননা একটা কাজ সম্পর্কে মণীষা অনেকখানি ভুলহীন, মানুষের কাজে অসম্পূর্ণতা থেকেই যায়। এইজন্যে আমি কেবল ধারণা করে গেছি, তাকে প্রমাণিত করে প্রত্যক্ষ করতে চাইনি। তবু ওই ক'বছর আমি অপেক্ষা করেছিলুম। অপেক্ষা করা উচিত, এই বোধ আমার তখনো ছিল। যদিও আমি সেই লোকগুলির জাতের যারা যৌবনে কখনো যুবক ছিল না, যৌবন বলে আসলে কিছু নেই বলে যারা যৌবন কী জানে নি, তবুও আমি ওই ক'বছর ভুল প্রমাণিত হবার জন্যে অপেক্ষা করেছিলুম। হয়ত তখনো আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারিনি যে প্রেম কেবল স্টুপিড ও প্রফেটের জন্যে যারা অমর, পৃথিবীর মহিলা কেবল তাদের জন্যেই আলনায় কাপড় কুঁচিয়ে রাখে। কিন্তু সে

যাই হোক, পাছে আমার ধারণায় অনবহিত কোনো ত্রুটি থেকে থাকে, এইজন্যে আমি আগে থেকেই সাবধান হই, ভুল প্রমাণিত হবার জন্যে কয়েকজনকে নিয়ে একস্পেরিমেণ্ট করি।

এদের নিয়ে ভেবেছিলুম : বাদল, চামেলি, চৌধুরিবাবু, রিণা, দিব্যকান্তি, মণিময় ও নৃপেন। অমূল্যর কথা আগে বলেছি। সে আমার বন্ধু।

বাদল ছিল যুবকপ্রতিম ; তার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা আমাকে আকৃষ্ট করে। আমি তাকে বলিনি, 'বাদল তুমি যখন এমন সুস্থ, সুস্থতার ঋণ কেন তুমি শোধ করছ না ?' যখনই আমরা টু-বি বাসে দোতলায় পাশাপাশি বসে গেছি, বিশেষত ক্যানসার হাসপাতালের দিকে আমি তার দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছি, কিন্তু, 'একবার হাসপাতালে যাও, দেখে এসো,' কখনো বলিনি। চৌধুরিবাবু আমাকে বলেছিলেন, চামেলিকে তুমি পাবে। যে ভাবে মানুষ একটা জিনিশ পেতে চায়, তুমি ওকে সেইভাবে চাও। তুমি করে গেছ অনেক কিছুই, কিন্তু কখনো কিছুর জন্যে চেষ্টা করোনি। এবার একটা জিনিশ পাবার জন্যে চেষ্টা করো। 'মনে রেখো', গম্ভীর ও জমকালো গলায় চৌধুরিবাবু আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'একটা জিনিশ তুমি চাইছ ; মেয়ে নয়। নইলে সব গুলিয়ে যাবে।' রেস্তোরাঁর কেবিনের উড়ন্ত পর্দার ধার থেকে চামেলি আমার দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে ছিল। 'তুমি ইন্বেসিল্ ছাড়া কিছু নও'—সে বলেছিল, 'কী এমন প্রেশাস্ ছিলাম আমি ? কেন তুমি জলের দামে আমাকে চাওনি ?' উঠে গিয়ে আমি তার গ্রীবা জড়িয়ে ধরিনি।

চামেলি এখন হাসিমারায়। রিণার বিয়ে হয়েছে কাছেই, ভবানীপুরে। সে আমাকে বলেছিল, 'কেন যাব আমি তোমার সঙ্গে ! তুমি কবি নও, অথচ তুমি রোজ দাড়ি কামাও না। সুপুরুষ

নও, তবু দামি স্যুট পরো না। তুমি কোনোদিন মোটরগাড়ি চড়বে না। তুমি কুৎসিত নও যে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারব না। আমি রূপসী; তোমাব পাশাপাশি আমি চৌরিঙ্গি দিয়ে হেঁটে যাব কী করে?' আমি তাকে বলে যেতে দিয়েছি। 'আমরা যে ভিড়ে হারিয়ে গেছি রিণা,' বাধা দিয়ে তাকে আমি বলিনি, 'আমরা যে আরো-বেশি মাইনে চাই না, কোনোকিছু করার জন্যে একসঙ্গে জড়ো-হওয়াতে আমবা যে আর বিশ্বাস করিনা। আমরা রোগা হয়ে যাচ্ছি। রিণা'…দু'হাতে তার হাত চেপে ধরে এ-কথা আমি তাকে বলিনি যে, 'সঙ্গম বিনা আমাদের কারুবই আর ঘুম আসে না।' 'কারো মুখোশ কোনোদিন তার মুখের মাংস হয়ে যায় না ভাই', এই কথা বলে দিব্যকান্তির চোখেব সামনে আমি কোনোদিন আমার মুখোশ টান মেরে খুলে ফেলে বলিনি, 'এই ছাখো প্রমাণ।' তার দু'আঙুলে চেপে-ধরা জাহাজ, গম্বুজ, শাদা শাদা ঘর ও ক্যানারি পাখি আঁকা পেন্সিলটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছি দেখে মণিময় বলেছিল, 'ছেলেবেলায় আমাদের এইরকম পেন্সিল ছিল, না?' বলে সে হেসেছিল। হাসি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তার কিছুই মনে পড়েনি, তবু সে বলছে, বিস্মৃতির পবিত্রতা সে কলঙ্কিত করছে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রকাণ্ড টেবিলটা পার হয়ে আমি তার মুখে হাত চাপা দিইনি যখন সে তারপরেও বলেছিল—'কোথায় গেল সেই-সব দিন।' 'হায়!' সে আরও বলেছিল। আমি তাকে বারণ করিনি। নৃপেন্দ্রকে আমি বলিনি, 'নইলে বাঁচার কোনো মানে হয় না বলে তোমাকে তো একটা-কিছু ভেবে নিতেই হবে নৃপেন, তাই তুমি মনে করেছিলে তুমি সৎ ও সঠিক, নিজের চরিত্রে কোনো গ্রেটনেস নেই বলে, মহত্ত্বটাকে নিজের চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেবে বলে, মনগড়া প্রোজেকশানকে তুমি তোমার চরিত্র বলে ভাবতে শুরু করলে। সকলে বলল, "হিপ্ হিপ্", "হুর্‌রা" বলে তুমি সঙ্ঘে যোগ দিলে। অফিসফেরৎ নরনারীর

নীরব ও নতমুখ শবানুগমন ব্যালকনি বা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তুমি দেখলে না, তোমার বন্ধুরা এল সারিবদ্ধভাবে, কেউ একা এল না। তোমরা আলাদা শোভাযাত্রা বের করলে। মদ খাওয়া উচিত নয় মনে করেছিলে বলে তুমি চা খেয়ে গেলে, প্রেম করা উচিত মনে করলে বলে প্রেম করলে, বেশ্যাপটিতে যাওয়া উচিত নয়, গেলে না। মহিলাকে কি তুমি ঘৃণা করে দেখেছিলে নৃপেন, গণিকাকে তুমি কখনো চাঁদ দেখাওনি। তুমি মনে করেছ তুমি এটা বিশ্বাস করো না, ওটা করো। মনে করেছ বলে বিশ্বাস করেছ, তবে তো কোনো কিছুই তুমি প্রকৃত-বিশ্বাস করোনি নৃপেন? উনিশ শতক পর্যন্ত মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল; ঈশ্বর যে নেই, একথা এখন নাবালক-সাবালক সকলেই জানে। তবু কেন তুমি এই ভুল করলে?

'মৃত্যুর পর যেমন স্ট্যাচু তুমি চাও, কেন তুমি সেইরকম মুখ তৈরি করছ?'

এদের নিয়ে ভেবেছিলুম। চামেলি, চৌধুরিবাবু, বাদল, রিণা, মণিময়, দিব্যকান্তি ও নৃপেন—এইসব। সবচেয়ে বেশি ভাবিয়েছিল বাদল ও চামেলি। অমূল্য আমার বন্ধু, তার কথাও বলেছি।

মানুষ হিশেবে এইসব মানুষের কাছে সম্পর্কের বোধ প্রার্থনা করেছিলুম, কারণ শৈশব থেকে সংশোধনের অতীত মৌলিকতাগুলি নিয়ে এরা সকলেই বেড়ে উঠেছিল। ভুল প্রমাণিত হবার জন্যে আমি এদের নিয়ে পরীক্ষা করি, ২০ থেকে ২৫, ওই ক-বছর বোধ ও বিশ্বাসের জন্যে আমি অপেক্ষা করেছিলুম।

এইসময় গোপালকে আমি প্রথম দেখি। লোকে গোপালকে শেষ দেখে চিৎপুরের কবিসভায়ঃ শুনেছি গোপাল সেদিন কবিতা পড়েনি, বলা যায়, আগাগোড়া চিৎকার করেছিল। কেবল শেষ লাইনটি সে পড়েছিল থেমে থেমে, 'শিল্পের প্রস্রাবরসে পাকে গণ্ড, পাকে মজ্জা কেশ···' তার কোমল ভ্রূ তুলে, শ্রোতাদের দিকে অবিকল চেয়ে থেকে সে পড়েছিল, গাছের ডালের মত ঈষৎ ঝুঁকে-পড়া তার শরীর, বিদ্রূপ ও ঘৃণায় বিকৃত তার মুখ, মুখের জটিল হাসি, এ-সবই আমি কল্পনা করতে পারি। সেই গোপালের শেষ কবিতা, সেই তার শেষ কাব্য পাঠ। তখন তাকে আর পাঁচজন নিষ্পাপ কবিযশপ্রার্থীদের একজন বলে মনে হয়েছিল। তখনো তার আগুন চেনা যায়নি।

বস্তুত, গোপালের সঙ্গে দেখা হবার আগে আমি তার কবিতা পড়িনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মুস্তফা আজকাল হাজার দেড়েক টাকা বেতন পান, কিছুকাল আগে গোপাল সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। এ-কথা সত্যি হতে পারে যে, টেবোর পথের অন্ধকারে আমার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গোপাল যে ডিলিরিয়াম বকেছিল, সেই তার চরম কবিতা, বা শ্রেষ্ঠ দান, কিন্তু এ-সম্পর্কে আমি তাঁকে কিছুই বলতে পারিনি। অত্যন্ত হতাশ হয়ে তিনি ফিরে যান। প্রকৃতপক্ষে, গোপালের কবিতা আমি কোনোদিন ভালবাসিনি, কবিকেও না।

আমি গোপালকে প্রথম দেখি চীনেপাড়ায়, হরিণবাড়ি লেনের এক মদের দোকানে। তখন ফাল্গুন মাস। দুপুরবেলা। সেদিন ছিল

দোল। রঙিন ধুলো উড়ছিল পথে পথে।

একটা লম্বা কাঠের টেবিলের ওপাশে, মদের বোতলের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে অবনত শরীরে বসেছিল বালকপ্রতিম সে, যেন তার পিছনে তার ঘাতক দাঁড়িয়ে আছে! বিদ্যুচ্চমকের মত সেদিন, অন্তত একবার, আমার সত্যিই মনে হয়েছিল, গোপালের পিছনে কে দাঁড়িয়ে ছিল, যে আমি ঘরে পা দিতেই পিছন থেকে ডানাদুটি নামিয়ে নেয়। কেননা পরমুহূর্তেই বুক থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত গোপালের ঋজুতা এমন প্রকট হয়ে ওঠে যে, দেখে মনে হয়, বুঝি তার শিরচূড়ায় সাপ ফণা তুলে রয়েছে! বাস্তবিক বিষ বড বেশি ছিল, তার শরীরে জ্বালা ছিল। গোপালের কথা মনে হলে আমার চোখের সামনে মদের বোতলটা তাই দীর্ঘতর হতে থাকে, ডালপালা ছড়ায়, পাতা গজিয়ে ওঠে। সেই ক্রমবর্ধমান অবয়বের গুঁড়ির দিকে জ্বালা জুড়োতেই মাথা নিচু করে সে বারবার এগিয়ে গেছে। গোপাল একটা কবিতাও লিখেছিল, 'বড় দীর্ঘতম বৃক্ষে বসে আছো দেবতা আমার…' সে লিখেছিল।

আমিও একবার জ্বলে উঠতে চেয়েছিলুম। পারফেকশান-সম্পর্কে আমারো একটা ধারণা ছিল বলে অস্তিত্বকে জড়ো করার কাজে আমি লাগি। এ ছাড়া কোনো কাজ আমি কখনো করিনি। জড়ো করে, যদি জড়ো করা যায়, আমি সেই বিপুল জড়ো-কে একবার স্পর্শ করতে চেয়েছিলুম। মাত্র একবার আমি জ্বলে উঠতে চেয়েছিলুম।

গোপালের সঙ্গে দেখা হলে আমি পুরো বুঝতে পারি, আমার সবই পণ্ডশ্রম হয়েছে, একদিনে সে আমাকে মিথ্যা ও ভুল প্রমাণিত করে। বৃথাই আমি জেগে আছি এতদিন, জেগে থেকে আমি কিছুই জানতে পারব না; আমি বুঝতে পারি, প্রবহমানতায় তাকে ছুঁতে হবে, ছোঁয়া এক সংঘর্ষ, সকল অস্তিত্বের সেই-ই এক লহমার জেগে-ওঠা, যে জাগা সাপের। মুহূর্তের জন্যে একবার আমি চেয়েছিলুম,

সকল স্নায়ুর ঐ আমূল জাগরণ, পিঠে একটা খড় উড়ে এসে পড়লে গোপাল যেমন দাঁড়াতে পারে তীব্র ফণা তুলে, তার দ্বিখণ্ড জিভ দেখাতে পারে। 'কে আমাকে নিপাতিত করতে চাও, করো।' রণক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বীরের মত এই উদাসীন নিমন্ত্রণ আমি জানাতে চেয়েছিলুম, সে ওই একবার ফণা তুলে সটান উঠে দাঁড়ানো; 'আমার আর-কিছু জানবার নেই, অব্যাহতি ছাড়া আমি কিছুই পেতে চাই না', এই অন্তিম গুণ, এই কথা বলার দীনতা আমি অর্জন করতে চাই। সেও সেই বিষধরের মাটিতে মাথা মিশিয়ে বারবার রোদ থেকে ছায়ার দিকে সরে যাওয়া। তাই আমার শরীরে বিষ-মেশানোর প্রয়োজন হয়। আমার বিষ ছিল না। গোপালের ছিল। বড় জ্বালা ছিল তার শরীরে।

প্রথম পরিচয়েই সে আমাকে অপমান করে। কাঁধের ওপর আমার প্রকাণ্ড মস্তিষ্ক পর্যন্ত উঁচু তার উদ্যত ছোবল তুলে ধরে। তার কাটা জিভ বের করে আমাকে দেখায়। রূপময় ডানা দু'টিকেও তার পিছন থেকে নেমে যেতে একাধিকবার দেখিনি কি? বারবার সে তাই মাথা মিশিয়ে দিয়েছে টেবিলে, বড় বেশি জ্বালা ছিল তার শরীরে, জ্বালা জুড়োতেই ক্রমবর্ধমান বৃক্ষের মূলে সে কান পেতে শুয়ে থেকেছে।

প্রথম দিনেই সে আমাকে বলেছিল, 'বড় ব্যথা করে।' তলপেটে হাত রেখে বলেছিল, 'এইখানে।' পুরানো দেওয়ালে রাজা পঞ্চম জর্জের ছবি, চীনেপাড়ার সেই গভীর দোকানে,উজ্জ্বল আলোর নিচে ও ঘননীল ধোঁয়ার মাঝখানে সে বসেছিল, তার সামনে বল্গাহীন মদের বোতল; পাপ পুণ্য কাম প্রেম কলরব বেদনা ও ব্যভিচারের নিরবচ্ছিন্ন স্রোতের ধারে টেবিল জুড়ে সে বসেছিল একা শোকাকুল সৌন্দর্য। কালো ও ঠাণ্ডা টেবিলের উপর, কফিনের উপর যেমন

এপিটাফ, তার কাটা হাত পড়েছিল। বা, জোনাকির মত ঝরঝরে দু'সারি দাঁত ও তার রঙিন ঠোঁট দেখেই আমার মনে হয়, 'এ ভঙ্গুর ও এ ক্ষণিকের। একে দেখা যাবে না বেশিদিন।' মনে হয়, প্রতিদিনই সে আমাকে বলেছিল, 'এইখানে বড ব্যথা করে।' শেষের দিকে তার শরীরময় সমস্ত জীবনে জ্বালা ধরে গিয়েছিল। মদ খেলেই সে ঘন ঘন থুতু ফেলত। 'দে কল ইট্ সিরোসিস,' গোপাল বলত থুতু ফেলে। 'ইচ ড্রপ হেনসফোর্থ উড মিন ডেথ্ ফর হিম,' সোঙ্‌রার ডাক-বাঙলোয় তাকে দেখে মিশনের ডাক্তাব আমাকে বলেছিল।

তারপর অল্পদিন সে কলকাতায় ছিল। মাত্র একরাত্রি আমি তার দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকি। আমার বিস্ফারিত চাহনি সর্বত্র তাকে অনুসরণ করেছিল। চোখাচোখি হবার মুহূর্তেই সে আমার চোখ এড়াতে চেয়েছিল, তারপর আমাকে এডাতে চায়। জল দিয়ে একটা পিঁপড়ের চতুর্দিকে গণ্ডী টেনে দিলে সে যেমন রেখার ধারে ধারে তীরবেগে ঘোরে, থেমে পড়ে, জল শোঁকে ও পালাতে চায়—গোপালও আমার পলকহীন তাকিয়ে-থাকার বাইরে বারবার পালাতে চেষ্টা করেছিল, চোখে ধুলো ছুঁড়ে মেরেছিল, গালাগালি দিয়েছিল, অপমান করেছিল। তবু সে আমার দৃষ্টিবিদ্ধতা এড়াতে পারেনি। সে আমার জেগে থাকাকে ঘৃণা করত।

নগরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে গেছে। শুঁড়িখানার বাইরে এসে গোপাল দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে পড়ে গলির সেই পিছল বিকেল, মৃদু শীত, তার মলিন চলাচল মনে পড়ে। মোড থেকে গম্ভীর পদধ্বনি তুলে হেঁটে আসে দীর্ঘ আফগান, তার কোমরে কালো কিংখাব, মহার্ঘ পোশাক থেকে জরি ঝকমক করে ওঠে। সিলিঙ থেকে ঝুলন্ত চামড়ার সারির নিচে হলুদ ফেজ-পরা মুসলমান

তামাক টানে, প্রাসাদের মত বিষণ্ণ বাড়ির অভ্যন্তর থেকে ভেসে আসে অর্গ্যানের এলোমেলো সুর, নানকিং-এর নিচে সুড়ঙ্গের মত একটা গলির মুখে গ্যাসপোস্টে হেলান দিয়ে একজন নীল নাবিক দাঁড়িয়ে; তার সম্মুখ দিয়ে পিঠে বাচ্চা বেঁধে অলস চীনারমণী খড়ম পায়ে রাস্তা পার হয়ে যায়।

শূন্য ও শান্ত চোখে গোপাল সেইদিকে তাকিয়ে ছিল. অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। তখনো বৃষ্টির ফোঁটা উড়ছিল হাওয়ায়, সাবানের ফেনার মত কয়েকটি রঙিন গ্যাসের আলোর ভিতর উড়ে যায়। 'স্প্রিঙ, বেইন!' বলে শিরছেঁড়া চিৎকার করে ওঠে গোপাল, এমন সহসা, যে, আমাব মূল পর্যন্ত হকচকিয়ে যায়। প্রবলতম সংঘর্ষে সে লাফ হয়ে জ্বলে ওঠে। সুড়ঙ্গের মুখে জমা অন্ধকার দু'ফাঁক হয়ে সরে যায়। 'স্প্রিঙ্‌রে ই ই ই ইন্‌...' গলিটার ভিতর দিয়ে মাথা নিচু করে গোপাল অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেই নীল নাবিক আর নেই। গলির মুখে গ্যাসলাইট জ্বলছে। ফর্ফর করে বৃষ্টির ফোঁটা উড়ছে আগের মতই। সুড়ঙ্গের মুখ এখন বন্ধ আবার অন্ধকার কেঁপে উঠছে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে হয় ঈশ্বরপ্রতীতি নেই এ নগরের। লুকানো খিড়কির পথে আজ বঁড়শি দিয়ে গেঁথে, তুলে, এই নগর গোপালকে তার অভ্যন্তর থেকে অভ্যন্তরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

সে সেইরাত্রে গোপালকে আমি ফের ধরি মতি শীল স্ট্রীটে। মেট্রোর সামনে দিয়ে তার চৌরিঙ্গি পার হওয়া মনে পড়ে। গাড়িগুলির দিকে বাঁ-হাত তুলে রেখে রাস্তা পার হচ্ছে গোপাল, সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ছে, পর পর জ্বলে উঠছে তাদের হেডলাইট। কেউ হর্ন বাজায় নি, নীরব হেডলাইটের অজস্র আলোয় উজ্জ্বল মাতাল গোপাল, তার সর্বস্ব ছড়াতে ছড়াতে, টলতে টলতে ষাট ফিট পার

হয়ে গেল।

গোপাল অনেকগুলি রমণীর কাছে যেত। তাকে অনুসরণ করে সেদিন আমি নীলার কাছে যাই। তখন মধ্যরাত্রি। নীলার ঘরে আবার আমাদের দু'জনের দেখা হয়। আরো মদ আসে, নীলার অনুরোধে আসে এক প্যাকেট উইল্‌স। মদ খেতে খেতে গোপাল অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ে যায়। আমি ও নীলা দু'জনে ধরাধরি করে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিই। নীলা তার জ্ঞানহীন দেহ আঁকড়ে ধরে। সে যখন কোমর জড়িয়ে ধরে, তার ছড়ানো চুলে গোপালের মুখ ঢেকে যায়। গোপালের বুকে সে মাথা রাখে। সেই মুহূর্তে আমার মনে হয় গোপালের সমস্ত বুক আচ্ছন্ন করে তার যন্ত্রণা, কাম ও স্বপ্নলোক ভেঙে পড়ছে, গোপালের বুকে মাথা রেখে, নীলা এখন ওর বুকের ভিতরের শব্দপাত, রক্তপাত ও ধ্বনিপাতের শব্দ শুনছে। মনে হয় তার মূল্যবান হৃদয়ের দিকে হয়ত সে নারীর উদ্ধত হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

জীবনে এই প্রথম আমি প্রকৃত-ঈর্ষা বোধ করি, সহ্যের অতীত ঈর্ষায় আমার স্নায়ুসকল পুড়তে থাকে। জিঘাংসা জেগে ওঠে। আমার সকল অস্তিত্ব জড়ো হয়। 'কে ওকে এমন কষ্ট দিচ্ছে।' গোপালের মুখ থেকে চুল সরিয়ে, আমার চোখের উপর তার সুর্মাটানা চোখ মেলে ধরে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি জানেন কে?' আমি তাকে মদের গ্লাস এগিয়ে দিই। আমার চোয়াল নড়ে ওঠে। জ্ঞানহীন গোপালের বুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে আমি টেনে আনি। কটি বেষ্টন করলে নেশার ঘোরে সে হেসে ওঠে। প্রয়োজন হবে বলে, প্যাকেট থেকে একটা উইল্‌স আমি সরিয়ে রেখেছিলাম। 'উইল্‌স খাবে নীলা?' আমি হেসে তাকে বলি। আমার দাঁত পেষার শব্দ সে শুনতে পায়। 'একটা উইল্‌স খাবে নীলআ-আ-আ··· চিৎকারে তার যোনিমূল ফাটিয়ে, ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করে, আমি জানতে চাই।

নীলার কাছ থেকেই আমি শরীরের ব্যাধি পাই। সে-ই ঈর্ষা জাগায়।

টেবো থেকে আমি গোপালের খবর পাই তিন বছর পরে। তখন বসন্তের শেষ।

টেবো রেঞ্জের ভিতরে একজায়গায় বন কাটা হচ্ছিল। গোপাল ছিল সেইখানে, সোঙ্‌রা বলে ওরাঁওদের একটা গ্রামে। চক্রধরপুরের ডি. এফ. ও. উপাধ্যায় আমাকে একটা কাঠ-আনার ট্রাক ব্যবস্থা করে দেন। চক্রধরপুর থেকে রাঁচি যাবার পথে ২৪ মাইল পাহাড় পেরোতে হয়, মাইল-১৬ গেলে পড়ে টেবো। টেবোর পর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সেরাইকেলা যাবার পথ ধরে আরো ৭।৮ মাইল ভিতরে সোঙ্‌রা। সোঙ্‌রার ডাকবাঙলোর বারান্দায়, ইজিচেয়ারে, মুখশ্রী বুকের দিকে লুটিয়ে, গোপাল শুয়েছিল। তখন বিকেল বেলা, চৈত্রমাস, পর্বতশিখর থেকে সরলরেখার মত দিন পড়ে যাচ্ছিল।

গোপালের কাছে গিয়ে আমি দেখি তার গা আগুন, মদের গন্ধ ভাপের মত উঠছে তার গা থেকে। গোপালের জটিল হাসি দেখে পরদিন মিশনের ডাক্তার আমাকে বলেছিল, 'হি ইজ অ্যান ইনসাল্ট টু দা ব্রেইন্।'

সোঙ্‌রা জায়গাটা অদ্ভুত। বাঙলো পাহাড়ের ওপরে, নিচে খেলাদেলির গ্রাম, নদীর ওপারে মাইল চারেক দূরে। পাথরের পাঁচিল দিয়ে তার একদিকে ঘেরা দেখা যায়। বাঙলোর রেজিস্টারে দেখলাম, ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে যা লোক আসে বছরে দু'চারবার, নইলে গোপাল ছাড়া দীর্ঘকাল কোনো বাইরের লোক সেখানে আসেনি। চৌকিদার জোসেফ, তার মা, তাদের দুটি গরু ও কয়েকটি কুকুর ছাড়া

আমাদের দু'চার মাইলের মধ্যে কোনো প্রাণী দেখিনি। গরুগুলিকে পাহাড়ে চরাতে নিয়ে যেত জোসেফের মা, বিকেলে ফিরত। রাত্রে বাঘের ভয় তাড়াবার জন্যে পাহাড়ের গায়ে আগুন জ্বালাত ওরাঁওরা, নিচে উপত্যকা জুড়ে জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে মাদলের শব্দ গড়িয়ে আসত কালো কালো বলের মত, খেলা করবে বলে কুকুরগুলো নদী পর্যন্ত ছুটে যেত। বন-কাটার জন্যে কনট্রাকটরের তৈরি সাময়িক পথ দিয়ে দিনে দু'বার ট্রাক চালিয়ে আসত ইসমাইল খাঁ, পাহাড়ের নিচে মাছির মত একবার দেখা যেত তার ট্রাক, গুঞ্জন তখন থেকেই শোনা যেত। চক্রধরপুর থেকে সে আমাদের জিনিশপত্র এনে দিত। এগারো দিন আমরা সোঙ্‌রায় ছিলুম। একদিনও সে মদ স্পর্শ করেনি। জ্বর গায়েই হেঁটে বেড়াত গোপাল। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ, সারাদিন শুধু হাওয়ার সঙ্গে ঝরাপাতার খেলা, সারাদিন পাতা ঝরত টুপটাপ। ঝরাপাতা মাড়িয়ে শালবনের ভিতর গোপালের পদশব্দ মিলিয়ে যেতে শুনেছি কতদিন। বেশিদূর সে যেতে পারত না, ফিরে আসত। পরে গোপালের একটা অপ্রকাশিত কবিতা পড়ি। 'ছুটে কে তুলিলে শালবন, বাহুবন্ধন চারিধারে,' অতি তরুণ বয়সে সে লিখেছিল।

বদগাঁও সোঙ্‌রা থেকে ১২ মাইল দূরে। সরকারী রা[illegible] অব্দি ট্রাকে গিয়ে, বাসে চেপে, রবিবার জোসেফকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বদগাঁও-এর হাটে যাই। হাটে দুপুর থেকেই আমরা তিনজনে প্রচণ্ড মদ্যপান শুরু করি। দিনশেষের রাঙামুকুল আলো হাটের মাঝখানে এসে পড়ে।

মদ খেতে খেতে আমি তখন সেই স্তরে এসে পৌঁচেছি, যেখানে রক্তের সব কোলাহল থামে, যখন শরীর ভাঁজে ভাঁজে খুলে যায়; যখন

কামনার চেয়ে প্রেম বেশি মনে হয়, প্রেমের চেয়ে বেশি মনে হয় উদাসীনতা।…মাইল দুই দূর থেকে গুঞ্জনধ্বনি ওঠে, ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত হতে হতে এঞ্জিনের শব্দ সমস্ত উপত্যকা জুড়ে জেগে ওঠে, টেবো যাবার শেষ বাস বদগাঁও-এ এসে দাঁড়ায়। চলে যায়।

আমার চোখের সামনে ডুবলো সব কিছুই। অন্ধকার গাঢ়তর করে চলাচলের ছায়াগুলি অন্ধকারে মিশে গেল। প্রকৃতি দ্বিগুন নিস্তব্ধ হলে দেখি অন্ধকার থেকে জোসেফ তার আকৃতি বের করে আনছে। জোসেফ আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। সে জানতে চায় আরো মদ খেতে চাই কিনা, তাহলে সে আমাদের এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। গোপাল একটা অন্ধকার গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল। জোসেফ যখন তার দিকে এগিয়ে যায়, পথের উপর চাঁদের আলো এসে পড়ে। তখনই তার' পিঠের কালোপাথরে ভাস্কর্যের মত দগদগে ঘা আমি দেখি।

জোসেফ আগে যাচ্ছিল। দু'ধারে পাহাড়, কখনো একদিকে গভীর খাদ, চডাইউৎরাই-এর পাহাড়ি রাস্তায় ঘন জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে আলো পড়ে আছে। দূরেকাছে আমরা জেসেফ-এর পদশব্দ শুনতে পাই।

মাইল পাঁচেক আমাদের হাঁটতে হয়েছিল। প্রায় জ্ঞানহীন অবস্থায় গোপাল আমার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছিল। তার গা গরম, তখন জানতাম না সেই তার শেষ ছুঁয়ে-থাকা। মাঝে মাঝে সে ভুল বকছিল বলে মনে হয়েছিল। আজ আমি জানি, শেষ জানা সে তখন উচ্চারণ করে বলছিল, তার চরম দান। যেমন, সে একবার বোধহয় বলেছিল :

এক মর্মরের শাদা বেদী
খুব উঁচু নয়
কিন্তু কী সুন্দর…

আর-একবার বলেছিল :

চোখের জ্বালা যায়
বুকের জ্বালা যায়

তখন ভাল করে শুনিনি, শুনে বুকে লাগেনি। কেননা, কবিতা আমি ভালবাসতে পারিনি কোনোদিন। কবিকেও না।

পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা বাঁ-দিকে একটা পাহাড়ে উঠতে লাগলুম। তখন আমাদের পায়ে জুতো নেই, ডালপালা সরিয়ে, কখনো ভেঙে, ধুলোপায়ে আমাদের উঠতে হচ্ছিল। পায়ের তলা থেকে খসে যাচ্ছিল গরম পাথর, গায়ে গা লেগে আরো নুড়ি গড়িয়ে পড়ছিল পাহাড়ের গা বেয়ে, হাঁ-করা শূন্যের ভিতর ছিটকে পডছিল।

হঠাৎ গোপাল থমকে দাঁড়ায়। পিছনে আমি ও সামনে জোসেফ, আমরাও থেমে পড়ি। জোসেফ-এর কাঁধে ভর দিয়ে গোপাল সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকায়। তখন বুঝিনি, জোসেফ-এর কাঁধে ভর দিয়ে সমস্ত শিকল ছিঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সর্বত্যাগী মাতাল, পাপ তাকে আর স্পর্শ করে নেই। শান্ত ফণা বাঁকিয়ে সাপ যেমন নিকটস্থ প্রাণীকে দেখে নেয়, তেমনি ঘাড় ফিরিয়ে একলহমা ধরে সে পিছনপানে তাকিয়ে আছে, দেখে যাওয়া প্রয়োজন বলে একসঙ্গে জীবনের সবটা সে একেবারে দেখে যাচ্ছে, দেখে নিচ্ছে তার সকল অতীত ; কারণ সেই মুহূর্তে সে তার জীবনের, তার অভিজ্ঞতার, চূড়ার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তখন বুঝিনি।

কেননা তারপরেই একটা সমতল চত্বর আমরা পাই। সহসাই আমরা দেখলুম চাপা আলো, সেই গোপন বাজার। তার লোক চলাচল।

গাছের গায়ে বাঁধা কেরোসিনের বড় বড় কুপি। ধোঁয়া জ্বলছে গলগল করে। জনতিরিশ নারী ও পুরুষের এই হাট, কারো ঠোঁট, কারো কপাল, হাতের রুপো ও কানের 'পলা, কারো বর্ণ, চুল আর চোখ, খিলানের মত কারো-বা গ্রীবা মাঝে-মাঝে দপ্‌দপ্‌ করে ওঠে। ঘন জঙ্গলের বুকের ভিতর সামান্য একটুখানি চত্বর, গোপনতম গোপন, কলঙ্কী মন্দিরের রূপ নিয়ে গোল অন্ধকার জেগে উঠছে, এ যেন তার ক্ষণিক প্রাঙ্গন। এত অপরিসর যে গায়ে গা ঘষে যায়। রমণীর নিতম্ব গায়ে লাগে, তার আঘাত। স্তন; তার করুণা।

এদিকে জুয়া খেলা হচ্ছে। পুরুষেরা দল বেঁধে খেলছে। পর পর অনেকগুলি ছক পাতা, তার ওপর আঁকা অস্ত্র, জানোয়ার, ঘর ও মুকুট, পদ্মের মত ফুল। ডিবার মধ্যে হাড়ের পাশা নড়ে উঠছে খর্খর করে, ডিবা উল্টে একজন পাশা চেপে ধরছে ছকের ওপর; ঘর, অস্ত্র, মুকুট ও পদ্মের মত ফুলের ওপর। জানোয়ারের পিঠের ওপর থেকে তুলে নিচ্ছে। সময়ের উত্থান ও পতনের ভিতর দিয়ে জয় ও পরাজয়ের রলরোল ভেসে আসে।

পুরুষেরা মাঝে মাঝে উঠে যাচ্ছে। ওদিকে একসার জালা। জালার পিছনে অন্ধকার রমণীরা দাঁড়িয়ে, কাঠের হাতা ডুবিয়ে মদ দিচ্ছে, রুপো ও তামা বেঁধে রাখছে আঁচলে। এইসব নারী ও পুরুষ, অস্পষ্ট এদের ধর্ম, সঙ্কেতময় চাপা এদের স্বর, এরা ব্যস্ততাহীন চলা-ফেরা করছে। এদের কারুকেই আগে দেখিনি, অথচ এরা সকলেই আমার চেনা। গাছপালা কি মানুষ সবই স্থির হয়ে আছে, তবু সকলেই থরথর করে কাঁপছে। আমরা মারাত্মক নিরাপদ, গাছের গুঁড়ি আমাদের দ্রুত ঘিরে ফেলছে। কেবল দীর্ঘকায় খাঁড়ার মত একটা গাছ, একটাই কেবল, হেলে রয়েছে চত্বরের উপর, তার গুঁড়ি মটমট করছে। আমি মাথা সরিয়ে নিলুম। বুঝলুম সবই। এখানে কেউ কোনো ঋণ আনে না।

জালার পিছনে দাঁড়িয়ে একজন স্ত্রীলোক আমাদের ডাকল।

যামিনীর অন্ধকারে শরীর উৎকীর্ণ করে ব্যভিচারিণী সে দাঁড়িয়ে আছে নিষিদ্ধ নিমন্ত্রণ তরল পারার মত জ্যোৎস্নায় তার মুখ পুড়ে যাচ্ছে তার দুই কানে শোলার কাঠি ও গলায় পলালমণ্ডিত নীল মালা রূপা তামা লোহা ও গালা এইসব ধাতু ধারণ করে কারুকার্যময় ভগ্নমূর্তির মত তুলাদণ্ড হাতে সে দাঁড়িয়ে শুধু তার চিরস্থির স্তনচূড়ায় রক্তাভ চোখ ধ্বকধ্বকিয়ে জ্বলছে

শাড়ির লাল পাড় পেটের নিচে নামিয়ে নাভি উন্মুক্ত করে সে আমাদের দেখায়···

স্পষ্ট হাতছানি দিয়ে সে গোপালকে ডাকল।

চৈত্র মাস। পাথর গরম। আমি দাঁড়াতে পারছিলুম না। আমার পা পুড়ে যাচ্ছিল।

আমি জুয়া খেলতে বসেছিলুম। সর্বস্বান্ত হয়ে গেলে, পাশ থেকে কেউ আমার হাতে ক্রমাগত পয়সা গুঁজে দিচ্ছিল। সে ফুরিয়ে গেলে দেখি, গোপাল নয়, সে একজন শাদা ওরাঁও, বৃদ্ধের মুখোশ পরে আমার দিকে চেয়ে আছে। তার জীবন্ত চোখের ঘোলাটে হাসি আমার বুকের ভিতরে গিয়ে পড়ে।

প্রতিটি লোকের গায়ে হাত দিয়ে আমি দেখি সে গোপাল কিনা। মদের জালাগুলির কাছে গিয়ে দেখি সব শূন্য, চপচপে শালপাতায় জায়গাটা ভর্তি, আঁচলে গিঁট বেঁধে রমণীরা অনেক আগেই চলে গেছে। জোসেফকে জুয়ার আড্ডা থেকে আমি ছিঁড়ে আনি। শূন্যে তুলে ঝাঁকি দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'কোথায় গোপাল?'

জোসেফকে অনুসরণ করে আমি জঙ্গলের ভিতর ঢুকি। একটা ঢালের কাছে পৌঁছে জোসেফ আমার হাত চেপে ধরে। হাত তুলে দেখায়।

জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যায়। ঢাল বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে একজন স্ত্রীলোক, তার মাথায় টুকরি, খোঁপা সে খুলে দিয়েছে। জঙ্ঘাকুন্তলস্তননিতম্ব ও গ্রীবা দুলিয়ে, বিশাল ময়ূরের মত রূপময় ডানা তুলে সে নেমে যাচ্ছে আগে আগে, ফাঁক করে পা ফেলে দুলতে দুলতে গোপাল নেমে যাচ্ছে তাব পিছু পিছু, তার সাপের মত ফণা উঁচু করে রেখে। আরো নিচে খাদের ভিতর রোরো নদীর কালো জল চকচকে-স্থিব হয়ে আছে। চাঁদ গড়িয়ে পড়েছে সেখানে। যেন পাতাল থেকে চাঁদ তাদের হাতছানি দিয়ে ডেকে নিচ্ছে।

গোপালকে আমি পিছু ডাকিনি। সেই তার শেষ চলে-যাওয়া, আর কখনো তাঁকে দেখিনি। এখন আমার বয়স ৩৮, তখন চৈত্রমাস, সে দশ বছর আগের কথা।

আ শা ল তা

কবিতা তুমি কোনোদিন ভালবাসনি শশাঙ্ক, কবিকেও না। গোলাপের কাঁটা ফুটে কোনো-এক কবি মারা গিয়েছিল বলে, জানি, কালো গোলাপই তোমার প্রাণাধিক প্রিয়।

তাই আমার গায়ে হাত পড়তে অমন চমকে উঠলে সেদিন, চুল তুলে নগ্ন করে দেখলে পিঠ, দেখলে কাঁটা, দুইহাতে আমার মুখ তুলে ধরে বললে, 'কই সে গোলাপ?'

তখনো তার বয়স হয়নি। 'বেলা যখন আঁধার হবে, রক্তিম ফিন্‌কির মুখে নিয়ে আসব সেই গোলাপ,' বলেছিলাম, 'তুমিই লবে।'

তুমি অপেক্ষা করলে না, হায়, তুমি ছিঁড়ে নিলে।

নলিনী শাটার নামিয়ে দেয়

আজ অতি অবেলায় ঘুম থেকে উঠে নলিনী রাসবিহারী এ্যাভিনূ-র একের-পর-এক শাটারগুলি নামিয়ে দেয় ; নলিনী ঘুম থেকে উঠেছে প্রমত্ত শক্তি নিয়ে, হাসি ঢোকে ঘরে, চান করে এসেছে—আজ তাহলে অফিস যায়নি হাসি ? সে ম্যারেড ব্যাচেলর, প্রায় ২-সপ্তাহ পরে আজ আবার বিবাহ করবে—জড়িয়ে ধরে শুইয়ে দেয় হাসিকে, প্রবল আপত্তি থেকে হাসি, অত্যল্প সময়, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডেই হয়ে পড়ে দ্বিধা-গ্রস্থ, ধ্বস্তাধ্বস্তি থেকে নেতিয়ে পড়ে। নলিনী শায়া তুলে ফেলে হাসির।

হাসিকে বিছানায় রেখে সে উঠে পড়ে, হাসি ততক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকবে আশা করে। ব্যগ্র হাতে আলমারি খোলে ও কোনায় হাতড়াতে থাকে। ব্রাশ, পেস্ট-এড, ডেটল, কালি, গঁদ, ভেশলিন, টুথপিক, এশেন্সের শূন্য শিশি ইত্যাদি সব পায়, তবু জেলিটা পায় না।···অবশেষে ওখানেই পায়। 'এতক্ষণ পাইনি কেন', এ-প্রশ্ন করে না ; ভয় করে। ইতিমধ্যে হাসি উঠে পড়ে ও সম্মতিসূচকভাবে বলে,

"বাথরুম থেকে আসছি।"

নিশি এসে পড়ে। বিশাল, কুৎসিত, মোটা ও বলশালী নিশি তাদের ঘরজোড়া ৪-টে চৌকির ওপর পাতা বিছানার একাংশ জুড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। নলিনী তাকে (নিশিকে) সাবান মাখিয়ে দেবে

কিনা জানতে চায়। নিশি সম্মতি দেয়। বিশেষত তার পায়ে ও পিঠে সাবান মাখিয়ে দেয় নলিনী। তার আরাম হচ্ছে দেখে নলিনী কৃতার্থ বোধ করে। একইসঙ্গে তার হাত ঘৃণা করতে থাকে নিশির এবড়োখেবড়ো পিঠ। নিশি তাকে (নলিনীকে) সাবান মাখিয়ে দেবার কথা বলে না। নলিনী চেয়েছিল নিশি এ-রকম প্রস্তাব করুক। তাহলে একটা equity হয়। যে জন্যে নলিনী সাবান-মাখানো কতকটা অসমাপ্ত অবস্থায় ছেড়ে দেয়। শুধু একটা পা ও পিঠে মাখানো হল।

তাদের দু'জনের কোমব তোয়ালে-জড়ানো ছিল; বাকিটা নগ্ন। নিশি তাকে বাঁ-হাত দিয়ে কাছে টেনে নেয়। তার শরীরের ফেনায় নলিনী পিছলে যেতে থাকে। নিশি তাব (নলিনীব) তোয়ালেটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে দেখে বিব্রতভাবে নলিনী বলে,

"কেন ভাই বেশ তো হচ্ছিল?"

কিন্তু তাকে হতচকিত কবে দিয়ে নিশি তার অঙ্গ খপ্ করে চেপে ধরে ও হাত দিয়ে ছ্যাখে। এই প্রথম নিশি এ-রকম করল, কত বেপরোয়া হয়ে গেছে নিশিটা, কী বকম risk নিচ্ছে, আগে নলিনীর delicacy-কে সে প্রত্যহ সমীহ করত। হাত দিত না নলিনীর গায়ে···

যাহোক ভাগ্যিস খানিকটা উত্তেজিত অবস্থায় ছিল নলিনী, নিশি যদি ভাবে এটা তার অনুত্তেজিত অবস্থা, তাহলে তার উত্তেজনা কোনো proportion-এই খারাপ বলা চলে না বা ছোট। নিশি হাত সরিয়ে নেয়। দেখাটাই তার উদ্দেশ্য ছিল মনে হয়, size-up করে রাখা। সে নিশ্চিত হতে চাইছিল বহুকাল থেকেই, আজ মরীয়া ও বেপরোয়া হয়ে তোয়ালের ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছিল হাত, সত্যি একদিক দিয়ে ভেবে দেখতে গেলে কী সামান্য না ব্যাপার—অথচ, অন্যদিকে,

এটাই নিশি বছরের পর বছর ধরে নানা ভাবে attempt করেও পারে নি। নলিনীর delicacy-ই তাকে বাধা দিয়ে এসেছিল এতকাল। আজ, অবশেষে, পারল। এতে নলিনীও নিশ্চিন্ত বোধ করে। যাক বাবা, এতদিনে সহজ হল সম্পর্ক, চিরস্থায়ী হল। তার কাছে এলে বা দূরে থেকে আর ছটফট করবে না নিশি।

হাসি এসে মেজদিকে ছাখায়। মুখভঙ্গি করে বলে,

"একী করছ তোমরা? মেজদি এসেছে যে,"

বলে চৌকির পাশে ইঙ্গিত করে। বিশাল নিশি উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। সে কিছুই জানে না। আর-কিছু জানার আগ্রহও তার নেই। প্রকাণ্ড বিছানার একপ্রান্ত থেকে নলিনী টেনে টেনে আসে শব্দ না করে ও তক্তাপোষের কিনারায় পৌঁছে কেবল গলাটুকু বাড়িয়ে ছাখে যে নিচেই একরাশ এঁটোকাটার মধ্যে, মাছের কাঁটা ও মাংসের ছিবড়ে ও হাড়ের মধ্যে চোখ উল্টে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে তার বিবাহহারা বন্ধ্যা দিদি। নিশি ফের তাকে টানাটানি করে। সে কিছুই জানে না, হাসির নিষেধ, মেজদি,—কিছুই জানে না সে বা আর-কিছু জানার আগ্রহ তার নেই। নলিনী বাধা দিতে চায়, ভাবে বলে ওঠে, 'মেজদি', কিন্তু পারে না। কারণ নিশি আজো তার মেজদিকে ছাখেনি, সে চায় না নিশিকে ছাখাতে। তবুও এঁটোকাটার মধ্যে মেজদির ক্ষমাহীন গম্ভীর ও অচপল মুখ তার বিবেককে পীড়িত করে, মেজদির স্থির চাউনি তার বুকের ভিতর গিয়ে পড়ে থাকে। নলিনীর দ্বিধা দেখে নিশি অধিকতর আগ্রহে তাকে কাছে টানে।

"বাথরুম থেকে ঘুরে আসি।"

নিশি উঠে পড়ে। নলিনীর সন্দেহ হয়। সেও ওঠে। লুকিয়ে ছাখে দরজা ফাঁক করে। বাথরুমে ঢুকে বাথরুম থেকে নিশি সোজা ঢোকে

রান্নাঘরে। হয়ত যা ভাবছে নলিনী তা নয়, নিশি নিশ্চয়ই একটা কিছু কথা বলার জন্যে ঢুকেছে, যেমন 'কেমন আছেন' বা 'এতক্ষণ এসেছি, একবার এলেনই না ঘরে,' নলিনী কৌতূহল চাপতে পারে না, এগিয়ে যায়। রান্নাঘরে ময়লা বাল্‌বের ঠিক নিচে. ঘরেব মাঝখানে হাসি ও নিশি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নিশি পা ফাঁক করে ঈষৎ ঝুঁকে, কিন্তু হাসির জড়সড় ভাব নলিনীর মোটে ভাল লাগে না, যেন সে এতক্ষণ রান্নাঘরে বাঘের ভয়ে লুকিয়ে ছিল, সে আরো সাবলীলভাবে কেন দাঁড়িয়ে নেই?

হাসি নলিনীকে ঢুকতে গ্যাখে। নিশি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে, দেখতে পায় না। হাসি নিশিকে নলিনী-ব্যাপারে কোনো ইশারা করে না। হাসিকে দেখে মনে হয়, সে চায় নলিনী স্বাক্ষী থাকুক সমস্ত ব্যাপারটার—যদি নিশি কিছু বেয়াদপি করে নলিনী তা স্বচক্ষে দেখুক ও তাকে তার পৌরুষ দিয়ে উচিত শিক্ষা দিক। এ জন্যেই নিশিকে সে সাবধান করে দেয় না মনে হয়। নিশিও জানে না, তার কিছু জানার আগ্রহ আর আছে বলে মনে হয় না।

স্টেজের উইংসের পেছনে একখণ্ড দেওয়ালের অন্ধকারে লাফ দিয়ে নলিনী চলে যায়—নিঃশব্দ লাফ দেয় সে। সে মুখ দেওয়ালের দিকে ফিরিয়ে রাখে। তার মণিবন্ধে ঘড়ি সময়ের কাঁটা ঘোরাতে থাকে অসম্ভব ধীরে, তবুও সময় যেতে থাকে। তারপর সহসা কোন একসময় সে feel করে চিৎকার করে ওঠার—সে,

"হ্রার্‌রারারারারারারা…"

বলে চিৎকার করে উঁচু থেকে গুপ্তঘাতকের মত লাফ দিয়ে নামে নিশি ও হাসির ঠিক মাঝখানে—প্রথমেই সে হাসির মুখের দিকে চেয়ে গ্যাখে। এখন তা র (নলিনীর) মাথার ওপর বাল্‌ব জ্বলছে, এখন তার গায়ে আলখাল্লা, পর্যবেক্ষক প্রীস্টের মত সে হাসির দিকে ঝুঁকে

দাঁড়িয়ে ; হাসিকে তার দিকে চেয়ে ঠোঁট চকাতে দেখা যায়। এর মানে কী? নলিনী ভাবে। তবে কি নিশি তাকে, হাসিকে, হাসি তবে কি নিশিকে, নিশিকে হাসি কি, তবে কি, নিশি কি, হাসি কি, হাসি কি নিশি, হাসিনিশি তবে কি চুমু খেয়েছিল? হাসির মুখে সে কোন উত্তর পায় না। expression-হীন মুখ, কিন্তু ঠোঁটদুটো এখনো চকাচ্ছে হাসির, সে আবারো নিশির মুখের দিকে চায়। কিন্তু নিশির মুণ্ডু আলোর ওপরে—শেডের জন্যে তার মুখ আদপেই দেখা যায় না—তাকে এক স্কন্ধকাটা মনে হয়। নলিনী ভাবে, আ—আলিঙ্গন করেছিল কি নিশি? সে হাসির শরীরের দিকে চায়, জামাকাপড় যথাযথ, সেখানেও কোনো উত্তর নেই। দু'জনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তার বিচারের অপেক্ষায়। চুমু খেয়েছিল নিশি? জোর করে খেয়েছিল? নলিনীর সবচেয়ে বেশি জানতে ইচ্ছে হয় হাসির সম্মতি ছিল না ছিলনা? এটাই জানতে ইচ্ছে হয় সবচেয়ে বেশি। হাসির সম্মতি ছিল? না। না। না। নাঃ। ওরা চুমুই খায় নি। ওরা চুমুই খায় নি। না খাবার কী আছে? নিশ্চিত খায় নি। নিশ্চিত খেয়েছে? নিশি পারে খেতে। নাআঃ, নিশি পারে কি? অতটা সাহস নিশির হবে না? নিশি কি বেপরোয়া বা মরীয়া? নিশি কি জোর করে চুমু খেল না সম্মতি ছিল হাসির? হাসির সম্মতি ছিল? yes or no? হাসির সম্মতি ছিল না। হ্যাঁ ছিল। না ছিল না। হ্যাঁ ছিল না। না ছিল না।

"No!"

রান্নাঘরে ঢোকার সময় সে তো দেখেছিল হাসির মুখ, মুখভর্তি নানাপ্রকার ইশারায় হাসি তাকে বলেছিল, 'দেখে রাখো। ও যদি কিছু করে তুমি নিজে দ্যাখো। তারপর যা শাস্তি দেবার ওকে দিও।'

কিন্তু তবে তার ঠোঁট চকাচ্ছিল কেন? সত্যচুম্বিতার মত কেন বিবর্ণ লাগছিল হাসির ঠোঁট! সে হয়ত এমনিই, তার ঠোঁট কাঁপছিল বা ভয়ে। একটা কিছু চেষ্টা নিশি করেছিল নিশ্চিত। কিন্তু পারে নি। নাঃ পারে নি। নিশি পারে নি। নিশি পারে নি।

এর পরে নলিনীকে একটা বেঁটে বামন তাড়াতে দেখা যায়। নলিনীই ছাখে নলিনীকে তাড়াতে। প্রথমে সে ছাখে যে নলিনী ও বামন সিঁড়ির ফে-কোনো বাঁকে চিরাচরিত ধারায় দাঁড়িয়ে—বামন মাথা উঁচু করে, নলিনীর মাথা নিচু—তারা পরস্পরকে •চাক্ষুষ দেখছে। সে কে, নলিনী টের পেয়েছে বৈ কি, তাকে বলে দিতে হয় না। তার বুক একদম ঠাণ্ডা ও মাথা ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে যায়। তার নাককান ও চোখমুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে দেখা যায়। কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে নলিনী ছাখে। সে বুঝতে পারে যে বামনের ও-রকম সামনে সম্পূর্ণ পরাস্ত সে (নলিনী) যা বলতে চায় তা হল ভয়ার্ত, 'একী! তুমি!' কিন্তু তার মুখে ভাষা জোগাচ্ছে না, এ কী সর্বনাশ হয়ে গেল নলিনীর, হায় সে ভাষা ভুলে গেছে বোঝা যায়। বামন এবার তার ডান-পা তোলে। নলিনী জানে এর মানে কী। এর মানে, 'কোথায় রাখব?' দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও নলিনী সব বুঝতে পারে। বামনের সামনে সে এখন চাইছে বেঁকে নিচু হয়ে যেতে, মাথা পেতে দিতে •চাইছে, অথচ তার শরীর সটান চিমনির মত দাঁড়িয়ে আছে। সে নত হতে পারছে না।

নলিনীর মাথা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তার সামনে বামন। বামন এক-পা তুলে দাঁড়িয়ে। তার মাথা উঁচু। যেন সে বলতে চায়, 'আর কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব?' নলিনীও চায় মাথা পেতে দিতে। কিন্তু, ওহ্ হো, এ কী অদ্ভুত, তবু তার চোখে পলক পড়ে না। তবু তার হাঁটু ভাঙে না। তফাতে দাঁড়িয়ে নলিনী ছাখে। এ

জিনিশ দেখা যায় না। শাস্তির পরিমাণ দেখে বোঝে পাপ কত বেশি হয়েছিল। সহ্যের অতীত অ-বর্ণনীয় পীডনের মধ্যে দিয়ে তার শরীর বেঁকে যেতে থাকে, তবু, বামনের-সামনে-নলিনীর যায় না।

এ-ভাবে সময় যায়। তাবপর, সহসা, এক-সময়, যে-কোনো সময়,

"গেট আউট।"

অবিশ্বাস্য নিচু স্বরে বামনের সামনে দাঁডিয়ে নলিনী বলে। যত নিচু গলায় বলে, বলেই তৎক্ষণাৎ পরে তত জোরে সে চিৎকার করে ওঠে,

"আই স্যে গেট্ আউট।"

অই নীরব বিস্ফোরণে নলিনীর চোখের সামনে ফেটে টুকরো হয়ে যায় নলিনীর শরীর, তার শরীর থেকে জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে অসংখ্য স্প্লিন্টার চারদিকে ঠিকরে পডে। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে যায়। আরো দু'এক বার সে ফাটে, আরো নীরবে। ধোঁয়ার ভিতর থেকে আরো দু'একবার শোনা যায় অটুট ও ভাষাময় ঐ নীরব বিস্ফোরণ।

ধোঁয়া কেটে গেলে নলিনী দূরে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। 'গেটাউট, গেটাউট' বলতে বলতে এবার একটা ছড়ি হাতে বামনকে তাড়া কবেছে নলিনী, সে ছাখে। বামন তাড়া খেয়ে সিঁড়ির একটা করে বাঁক নামছে, তার পরেই দাঁড়িয়ে পড়ছে। সে বাড়িতে থাকতে চায়। একঘেঁয়ে টানা গলায়, গেটাউটগেটাউটগেটাউটগেটাউটগেটাউট বলতে বলতে তরতর করে, ছড়ি ঘুরিয়ে, ঐ পর্যন্ত নেমে যাচ্ছে নলিনী, বামনও ছুটে নেমে যাচ্ছে ও সিঁড়ির অপর বাঁকে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ছে। সে বাডিতেই থাকতে চায়। একটানা 'গেটাউট' বলতে বলতে নলিনী আবারো তেডে যায়।

যাই হোক, এ-ভাবে বেশ কয়েকতলা তাড়াতে তাড়াতে নেমে, অবশেষে তাকে 'গেটাউট' বলে এমন তাড়া দেয় নলিনী যে বামনও এবার 'গেটাউট' বলে প্রতিধ্বনি করে ওঠে, ও একঘেঁয়ে টানা সুরে প্রায় বিড়বিড় করে "গেটাউট—গেটাউট—গেটাউট—গেটাউট—গেটাউট" বলতে বলতে এবার সত্যিকারের (convincing) গতিবেগ নিয়ে ধাপে ধাপে নেমে যেতে থাকে, বস্তুত তাকে পরের বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা তো যায়ই না, বরং বেশ আরো কয়েকতলা নিচের বাঁকে তাকে আরো দ্রুতগতিতে বাঁক নিতে দেখা যায় ও তখনো তার আবছা 'গেটাউট' শোনা যায়।

নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাসে নলিনী এবার ওপরে উঠতে থাকে। তার রাসবিহারী এ্যাভিনু-র ফ্ল্যাটের সুদূর দরজায় পৌঁছে সে দ্যাখে সিঁড়ি আরো ওপরে উঠে গেছে, উঠে ভেঙে গেছে। নিচে তাকিয়ে দ্যাখে বামনটাও পৌঁছে গেছে গেটে, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে 'গেটাউট গেটাউট' বলে চ্যাঁচাচ্ছে ও গায়ের জোরে ঠেলে দারোয়ান গেট খুলে তাকে বেরিয়ে যেতে দিচ্ছে। ও চিরকালের জন্যে, ও প্রতিবেশী ও অপ্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের জন্যে, ও পরিচিত অপরিচিত বন্ধুবান্ধব—সকলের জন্যে ধীর ও নিশ্চিত গতিতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঝনঝন শব্দের সেই বিশাল গেট। কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে নলিনী বন্ধ হয়ে যেতে দ্যাখে।

আত্মক্রীড়া

সুচিন্তিত, ঠাণ্ডা মাথায় লেখা, চেষ্টাহীন রচনা

কুনালের বাড়িতে পিয়ানো : কুনাল পিয়ানোর ডালা তুলে কিছু টাকা বের করছে—কুনাল একটা জেব্রা কিনবে বিক্রম কিনে দেবে—টুপি বগলে চেপে বিক্রম শান্ত দাঁড়িয়ে—দেখছে ; কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছি না—ঈষৎ খোলা ডালার ফাঁক দিয়ে আমি লম্বা করে হাত ঢুকিয়ে দিই—পিয়ানোর একটা রীড আঙুলে লাগে—আঙুলের ডগা দিয়ে সেটা টিপলে কোনো সুর বাজল না এটা আমার মনেই পড়ে না কারণ আশ্চর্যজনক আবিষ্কার তখন আমি এই করেছি যে পিয়ানোর রীডটা নরম—সেটা শক্ত নয়—নরম এ-কারণে যে সেটা টিপলে অনেকটা বসে যায়—মনে হল এই সত্য আবিষ্কার—এর softness—(তার কারণও জানতে পেরেছি)—এ যদি ভুলে যাই চিরকালের জন্যে ভুলে যাব ও তা বিপজ্জনক--ভুলে যাব বলে এইজন্যে এটা লিখে রাখা অবশ্য প্রয়োজন ; তারপরই মনে হল কাগজকলম যখন ত্রিসীমানায় নেই বিক্রমের কাছে নেই মানবেন্দ্রর কাছে নেই চৌধুরিবাবু বা কুনালের কাছে নেই—হয়ত বেচু কিছু দিতে পারে কিন্তু সে ৪০ মাইল দূরে থাকে বলে তার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারব না কোনোদিন বা এখনই আর দেরি হলে ভুলে যাব—ভুলে গেলে জঘন্য অন্যায় হবে ও অভাবনীয় ক্ষতি হবে যে-জন্যে মনে হল বিক্রম ও কুনালকে চেঁচিয়ে

বাল—আমি ছাড়া আরো দু'জন জেনে রাখুক ; বীডের softness তখনো আমার আঙুলের ডগায় লেগে ছিল

শ্রীমন্ত দে লেন থেকে মিশন রো-তে বেরিয়ে পড়ে আমরা তিনজনে হাঁটতে থাকি একসঙ্গে নয় এলোমেলো , বিক্রম কিছুটা দেওয়াল ঘেঁসে ও কুনাল ফুটপাত ধরে অনেকটা এগিয়ে এগিয়ে হাঁটছে—আমি ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমে পড়ি—মৃদু ও মেধার্দ্র টান আমাকে রাস্তার ।ভাবে টেনে নিয়ে যায়

সেখান থেকে দেখি হিন্দ সিনেমা পর্যন্ত দেখা যায় ও রাস্তা অসম্ভব চওড়া—ফাঁকা বাড়িগুলিতে আলো জ্বলছে না অথচ দিনের বেলাও নয়—ঝকঝকে পিচের রাস্তা অসম্ভব চওড়া—এখনো লোক চলেনি রোদ পড়েনি ট্রাফিক চলেনি ধুলো জমেনি—হিন্দ সিনেমা পর্যন্ত নিস্তব্ধতা ও চলাচলহীন শান্তি—খটখটে শুকনো . একটু ছাড়াছাড়া ভাবে কুনাল বলল, "আমি চললুম—কফি হাউসে অপেক্ষা করছি—তোরা আস্তে আস্তে আয়"—বিক্রম ফুটপাতে দাঁড়িয়ে —আমার হাত পাঞ্জাবির পকেটে ডোবানো—মুঠোয় পিয়ানোর চাবি —সহসাই বাড়টা অসম্ভব pressing মনে হয়—শরীরময় সমস্ত জীবনে সহ্যের অতীত চাপ বোধ করি—উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপতে শুরু করে—ক্রমশ সাড়হীন হয়ে পড়ছে—আমার হাত—একখণ্ড আমার আমা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে দেখে রাস্তার মাঝখানে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আমি বিক্রমকে চেঁচিয়ে ডাকি,

"লুকহিয়ার বিক্রম!"

বিক্রম মুখ ঘোরায় কিনা আমি দেখি না—হিন্দ সিনেমা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল—হিন্দ সিনেমা পর্যন্ত পৌঁছয় এমন ভাবে আমি— পিয়ানোর বাড়টা মুঠোয় ধরে আমি—হাত শরীরের চতুর্দিকে ঘুরিয়ে হিন্দ-সিনেমা-পর্যন্ত-আমি একটু ঝুঁকিয়ে সেটা ছুঁড়ে দিই ; তবু

ততটা উঁচুতে ওঠে না—তীব্র চোখে আমি ও বিক্রম তার গতি দেখি—দেখি কোথা দিয়ে কী ভাবে ও কতদূরে যায়—খানিক দূরে গিয়ে সেটা রাস্তার ওপর পড়ে খর্খর শব্দে গড়িয়ে যেতে থাকে

ও ঠিক সেই সময় হিন্দ সিনেমার সামনে ৪।৫ জন যুবক দেখতে পাই; হয়ত দলে তারা আর-একটু ভারি ছিল—৪।৫ জন যুবাই আমরা দেখি; তারা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল—দেরি আছে মুখোমুখি হতে—ততক্ষণে আমবা একটা কিছু ঠিক করতে পারব কী করা যায়—ব্যবধান এখনো বেশ বেশি; কালো ও চৌকো চাবিটা রাস্তায় পড়েই লাফিয়ে উঠেছিল—তারপর খর্খর করে সেটা দ্রুত তাদের দিকে গড়িয়ে যেতে থাকে; কত জোরে ছুঁড়েছিলুম জানিনা—কত জোরে হাত ছুঁড়েছিল আমি টের পাইনি—চাবিটা গড়াচ্ছে; ওরা মোট কতজন ছিল জানিনা—জনপাঁচেক মোটামুটি দেখতে পেয়েছিলুম—ওরাও এরকম হবে আশা করেনি—দূব থেকে রাস্তার মাঝখানে আমাকে পা ফাঁক করে পোজিশন নিতে দেখেই ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে আচমকা—রীডটা কাছাকাছি পৌঁছলে একজন এগিয়ে এসে সেটা তুলে নিয়েছিল—আমি তাকে দেখতে পেয়েছিলুম ভালোই

তার বয়স আমাদের চেয়ে কম সে একেবারে তরুণ বয়সের; ছেঁড়া নয় ময়লা শাদা প্যাণ্ট পরে ছিল সে ও হাফশার্ট তাও অনেক দিন ধরে পরে আছে—তারা নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়েছিল, পিয়ানোর চাবিটা রাস্তা জুড়ে দীর্ঘতম বাঁক নিয়ে তাদের কাছাকাছি পৌঁছবার ঠিক আগে দল ছেড়ে দু'কদম এগিয়ে এসে পোজিশন নিল সে—সেই ময়লা তরুণ—আ, ছোট্ট মাথাটা পা'র দিকে ঝুঁকিয়ে দু'ভাঁজ করে ফেলল তার শরীর—নিচু হয়ে শিকড়সুদ্ধ কচি ডালপালা সমেত হাতটা ঈষৎ বাড়িয়ে দিয়ে চাবিটা তুলে নিল—নিয়েই একবার লুফে দেখল; তার অবলীলা দেখে আমাদের মনে পড়ে আমার ছোঁড়ার মধ্যে কত effort ছিল—আর তার—

আমাদের দিকে পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার লুফে দেখল সে বা বন্ধুদের দেখাল ; তারপর আবার ঘুরে আমাদের প্রস্তুত হবার একটুও সুযোগ না দিয়ে চকিতে সে চাবিটা ছুঁড়ে দিল আমাদের দিকে —অনেক বেশি উঁচুতে উঠে গিয়ে সেটা অনেক বেশি শূন্য অতিক্রম করে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়ল—তীব্র ও জ্বালাভরা চোখে আমি ও বিক্রম তার গতি দেখি—তার গতিপথ অনুসরণ করে সার্চলাইটের ডোমের মত আমাদের মাথা ঘুরে যেতে থাকে—আমরা দেখি শূন্যে বিশাল অর্ধবৃত্ত রচনা করে সেণ্ট্রাল এ্যাভিনু ছাড়িয়ে সাবলীলভাবে সেটা মিশন রো ও বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিট জাংশনে গিয়ে পড়ে—তারপর বড় বড় পাক দিয়ে গড়াতে গড়াতে টেরিটিবাজারের দিকে যেতে থাকে দেখতে পাই—যতদূর দেখা যায় তার চেয়ে বেশিদূর তাকে অনুসরণ করি—চোখ ছিঁড়ে যাচ্ছিল তবু দেখতে থাকি—তারপর আর দেখতে পাই না—কিন্তু মন্থর-হয়ে-আসা তার গতি দেখে ঠিক কোথায় সেটা পড়ে আছে টের পাই ; বহু দূর চলে গেছে—অনেক বেশি দূরে—আমাদের দিনের তুলনায় আজকাল মাধ্যাকর্ষণ কমই

হয়ত তখনো তারা পরস্পর কনগ্র্যাচুলেট করছিল ; কিন্তু আমাদের হাতে আর সময় নেই—উত্তেজনা বড় বেশি হয়ে পড়েছিল—অত্যধিক চাপের জন্যে হাত ছিঁড়ে যায় দেখে কী করা উচিত বুঝতে না পেরে আমার করতালিপ্রিয় মূঢ়তার জন্যে আমি সেটা ছুঁড়ে দিয়েছিলুম "দেখুক বিক্রম" এই ভেবে—এই আমার ভুল ; অপ্রত্যাশিত ওদের সহসা দেখে আমি বুঝতে পারি যে এই তবে ছিল আমাদের অজ্ঞাত দিক ? কিন্তু ওরাও ভুল করে—ওরা বা অন্তত সেই ছেলেটি—সে ভাবে আমরা ওদের স্পোর্টে ডাকছি—এই তার ভুল ; এক যুবকের ভুলে এক জেনারেশনের ভুলচুক হয়ে যায়

নগরের অভ্যন্তর থেকে অভ্যন্তরে পিয়ানোর চাবির জন্যে আমরা

এবার ছুটতে থাকি লাফিয়ে লাফিয়ে, বিক্রম ছায়ার মত আমার অবিরল পিছনে—ঠিক জায়গায় পৌঁছে একটা ল্যাম্পোস্টের নিচে গোল আলোয় হাতডাতে থাকি—চাবিটা পেয়ে যাই—আঃ, হাত দিতে তার চৌকো ও নরম আবারো অনুভব করি: একটু ছড়ে গেছে—একটু অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়েছে মনে হয় নইলে সেই চাবিটাই—এবার বিক্রমও সেটি স্পর্শ করে—মুঠোয় ধরে যা বোঝার বারবার বোঝে

আবার কুনালের বাড়ির ভিতরের ঘরে; একটা লম্বা করিডর-মতো সেটা—কোনাকুনিভাবে পরপর টেবিল ও চারটে করে চেয়ার সাজানো টেবিলের ওপর ধুলোঝাড়া কাগজের ফুল—ব্র্যাকেটে মৃদু আলো ও উপুড়-করা গ্লাস ন্যাপকিন ইত্যাদি—একটা B A R; কাউন্টারের দিকে পিছন ফিরে পিয়ানোর ডালাটা তুলে ফেলি—সবটা ওঠে না—ওঠানো যায় না—আমি হাত ঢুকিয়ে দিয়ে নার্ভাস হাতে রীড-এর শূন্য জায়গাটা খুঁজতে থাকি—বিক্রম পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে—দেখুক—দোষ আমারই—আমি তা স্খালন করার জন্যে দৃঢ় চেষ্টা করছি—পাশে দাঁড়িয়ে দেখাটাই সাহায্য বা বন্ধুত্ব—এ-ছাড়া কোনো সাহায্য সে আমাকে করবে আমি আশা করিনা

উঁচু কালো বার্মা-টিকের কাউন্টার থেকে কুনালের বাবার ঘড়ঘড়ে গলা শোনা যায়; ভাষা বোঝা যায় না—বাঙলা ভাষাই হবে—কিন্তু যা বলতে ১০-মিনিট লাগে তা ৫-সেকেণ্ডে হুড়মুড় করে বলার জন্যে আমরা বুঝতে পারি না—মনে হয় আমাদের নয় বীয়ারারকে কিছু বলছেন—কাস্টমার যারা এবার প্রবেশ করে চেয়ারগুলোয় বসবে তাদের জন্যে মনে হয় কিছু ব্যবস্থা করতে বললেন; এটা বুঝেছিলুম আমাদের উনি দেখতে পাচ্ছেন না বা আমরা ওঁকে বা আমাদের জন্যে ওঁর বলার কিছুই নেই—"হি ইজ নট বদার্ড এ্যাবাউট আস—" বিক্রমকে আশ্বাস দিয়ে আমি জানাই কেননা গলার ঘড়ঘড় শুনে সে দু-একবার পা বদলেছিল

কিন্তু চাবির জায়গাটা যে কিছুতে খুঁজে পাচ্ছি না ; বিক্রম বুঝতে পারছে আমি খুঁজে পাচ্ছিনা—সে তবুও নতমুখে দাঁড়িয়ে—তার বগলে যথাযথ টুপি—তবু সে আমাকে খুঁজতে সাহায্য করছে না যে-কারণে তার জন্যে বন্ধুত্বের অদ্ভুত আবেগ বোধ করি

আমি পিয়ানোর ড্রয়ারগুলো দ্রুত খোলা-বন্ধ করতে থাকি ; যা ভেবেছিলুম—দেখি সবগুলি ড্রয়ার গরমের জামাকাপড়ে ভর্তি—চকচকে নতুন জামাকাপড় সব—কুনালের মায়ের একটা শাল—তার চিক্কণ পাড় থেকে ক্যাপ্সটান টোব্যাকোর পাউচের সোনালি ছিটকে গায়ে লাগে—খালি শীতের দিনের দামি দামি জামাকাপড় সব—সব টাকা তো কুনাল নিয়ে বেরোয় নি—অর্ধেক রেখে গেছে—তা ছাড়া বাড়ির টাকাও এখানেই আছে—কিন্তু কোথায়

আমি ক্রমশ বুঝতে পারি টাকা পিয়ানোর ভেতরেই আছে কিন্তু আমি পাব না ; "সব এভাবে খোলা যায়" আমি বিক্রমকে বলি, "না হয় আমি খুলছি—কিন্তু চোর এলে তো সমস্ত টাকা নিয়ে যেত"

জেব্রা কেনার জন্যে টাকা যা বের করেছিল কুনাল সবই বিক্রমকে দিয়ে গেছে ; "দ্যাখ দিকি" দুঃখিত স্বরে বিক্রম বলতে থাকে,"মিছিমিছি জেব্রার জন্যে কুনাল এত টাকা নষ্ট করছে—এ-টাকায় মদ খাওয়া উচিত—উচিত কিনা বল্—এ-টাকায় মদ খেলে কী গ্রেট্ হতো ; নষ্ট করছে টাকা—টাকা নষ্ট হচ্ছে—কুনাল আজকাল অনেক টাকা রোজগার করছে—"

"কিন্তু" দৃঢ়স্বরে সে বলে, "এ টাকায় মদ খাওয়া চলে না—কুনাল ভীষণ দুঃখ পাবে—ভীষণ দুঃখ পাবে কুনাল তাহলে—"

"পোষও মানবে না কিছুই না খামকা—"বিক্রম গজগজ করতে থাকে, "জেব্রা পোষ মানে না—আমি জানি—"

চাবিটা গলিয়ে ভেতরে ফেলে দিয়েছি ; ডালা নামিয়ে পিয়ানো ছুঁয়ে বার-এর কোনায় আমি দাঁড়িয়ে—পাশে বিক্রমের মত বন্ধু—

পিয়ানো ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আমি ক্রমে বুঝতে পারি জেব্রার টাকায় মদ খাওয়া কত প্রয়োজন—মদ খেতে আমরা বাধ্য—বা এখন হ্যাঁ-না করলেও পরে আমরা খাবই কার' জেব্রার জন্যে টাকা খরচ করা ভুল—কোন লাভ হবে না—কুনালের চেয়ে আমরা বেশি জানি—আমরা ঠিক জানি ; সাজানো বার-এর কোনায় দাঁড়িয়ে মদ না-খেতে পারার জন্যে বিক্রমকে বজ্রাহতের মত দেখায়—আমিও বুকে অসম্ভব কষ্ট বোধ করি ; যদিও কুনালের টাকা—কিন্তু এ-টাকা মদের জন্যেই characterised আমরা বেশ বুঝতে পারি—উত্তরে ঘুমচোখে বিক্রমকে আমি বলি, "একথা আমি অন্তত-একজন মহিলাকে বুঝিয়ে যাব যে সঙ্গম বিনা আমাদের কারোরই আর কোনোপ্রকার ঘুম হয় না"

কুনালের সদর ঘরে দেখি বাসুদা দেওয়ালের দিকে মুখ করে ডিসভর্তি কী-সব খাচ্ছে—মাংসপেঁয়াজ—পাশে বীরেন ; "কী বীরেন বিয়ের খাওয়া খাওয়াচ্ছ বুঝি বাসুদাকে" আমি বীরেনকে বলি—বীরেন লাজুক হাসে—বাসুদাও হাসতে থাকে—বীরেন আমাকে কোনোদিন বিয়ের খাওয়া খাওয়াবেনা ভেবে আমার দুঃখ থেকে রাগ হয়ে যায়—আমি বাসুদাকে বলি, "বাসুদা আপনাকে সবাই বিয়ের খাওয়া খাওয়াবার জন্যে খুঁজে বের করে অথচ আপনি একজন কবি" বলে বাসুদার মুখের দিকে না তাকিয়েও আমার অনুতাপ হয় ; ছি ছীঃ কেন বললুম আমি সত্যি কথা—তার ইনোসেণ্ট পৌরুষে আঘাত দেওয়ার কি এতই প্রয়োজন ছিল—তাড়াতাড়ি বললুম, "বৌদি কেমন আছেন বাসুদা—মেয়েটা কেমন আছে—অনেকদিন যাইনি আপনার বাড়ি"—"রবিবার সকালে এস না" বাসুদা আমায় বললেন, "না সামনের রবিবার কাজ আছে—তার পরের রবিবার এসো—এ্যাঁ"—যাক বাবা সব ঠিকঠাক হয়ে গেল—বীরেনও খুব চটেছে—ওর রাগটাও মসৃণ করে দিয়ে গেলে হত—কিন্তু আজ আর সময় নেই—দিয়ে যাবার সময় হল না আজ—একটা কাজ বাকি থেকে গেল

রাস্তায় বেরিয়েই একটা পেট্রোল-পাম্প পড়ে ; কুনাল দুঃখ পাবে বলে আমরা খানিকটা করে মোটরঅয়েল খাই—"এ-ভাবে খা" হাঁ করে টিনটা মুখের ওপর উপুড় করে ধরে বিক্রম—উড়ন্ত ঘোড়া-মার্কা তোবড়ানো টিন থেকে বুকবুকবুকবুকবুক বুক বুক শব্দ শুনতে পাওয়া যায়—বিক্রম খায় সরাসরি টাগরায় ঢেলে—"এইজন্যে আমার কোনো টেস্ট এ্যাকোযার করার ব্যাপার নেই" ও হেসে বলে, "জলে যায় আলজিভটুকু যাবে"

ক্রমে বিক্রমের মাথা থেকে শিঙদুটো গজাতে থাকে ; ওর ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে শুনতে হাঁটি—"কুনাল আজকাল অনেক টাকা রোজগার করছে" যেতে যেতে বিক্রম আমাকে জানায়

বৌবাজার অব্দি হেঁটে গিয়ে আমরা আমাদের লাল ও দোতলা লাস্ট বাস দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাই ; "তোমাদের জন্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছি বিক্রম" ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে বেচু আমাদের ডাকে—"আর উঈ ইন ডেন্‌জার" আমি জানতে চাই—"এ্যালেনের মত লোক কখনো দেখিনি" ঘোরতর লাল চোখে বেচু আমাকে বলে—"বুঝলে বেচু" বিক্রম জানাতে থাকে "কুনাল আজকাল অনেক টাকা রোজগার করছে—বেশ খর্চাও করছে আজকাল—বুঝলে বেচু খুব ভালো হয়ে গেছে কুনাল—রাত্রে বাড়িতে থাকতে দেয়"

"কলকাতার সমস্ত দম্পতি যৌনপ্রেরণা পায় আমাদের প্রতি ঘৃণা ও আক্রোশ থেকে তুমি জানো"—বেচুকে আমি জিজ্ঞাসা করি ; তার দ্বিধা আমার অসহ্য বোধ হয়—উরুতে থাপ্পড় মেরে আমি তাকে বলি "I can challenge you on this"

"শুধু তাই নয়" আমি বলে যেতে থাকি "কমিউনিস্টকংগ্রেস-বঙ্গসংস্কৃতিকালচারালক্রীড়ামস্বাধীনসাহিত্যসমাজপাকভারতচীনভারত-এমারজেন্সিনিরস্ত্রীকরণকিউবাকেনেডিক্রুশ্চেভ—পৃথিবীময় এত যৌন-কনফারেন্স—এসবও আমাদের প্রতি বিদ্বেষবশতই" কিন্তু আমার কথা

শেষ হবার আগেই ইলেকট্রিক এঞ্জিনের মত সোঁঅঅওওওও করে স্টার্ট নিয়ে সহসা দ্রুততম স্পীডে বাস চলতে থাকে দুই ঋতুর মাঝখান দিয়ে বাস চলে যেতে থাকে স্টপেজহীন দ্রুত ও বেলা থেকে অবেলায় টপ স্পীডে বাস চলতে থাকে

বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে

বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে , বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে

বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে

বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে ; বাস চলতে থাকে…

ঐ দিকে

পান্নালালের দেখলুম ডান-পা হাঁটুব পর থেকে প্লাস্টাবের—বাঁ-পায়ের দেড়গুণ লম্বা—ডান-পা চিতিয়ে বেখে রাস্তার নর্দামায় পেচ্ছাপ কবছে পান্নালাল—চারদিকে ছিটিয়ে ঘোড়াব মতো রাস্তা ভাসিয়ে হুড়হুড় করে রক্তপ্রস্রাব কবছে সে—দক্ষিণেব দিকে—উত্তরের দিকে—পশ্চিমেব পানে : দেখে মনে হয়, দু'বছর ধরে ক্রমাগত রক্ত-প্রস্রাব কবে আজো কি শাস্তি শেষ হয়নি পান্নালালের—আবার পা ? পান্নালাল ঘাড় বেকিয়ে আমার দিকে স্মিতচক্ষে একবার তাকায়—তারপর ফিরে যেতে থাকে সিউরিসি ওয়ার্ডে তার বেড-এর দিকে—বিচাবের বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই

রাস্তা কিছুসময় ফাঁকা পড়ে থাকে : একটু পরে অবনতমাথা ল্যাম্পোস্টের মত ঝুনুদিকে হেঁটে আসতে দেখি : ঝুনুদি এসেই পান্নালালের কথা জিজ্ঞেস কবে—বলে, "প্রেম করে স্কুলমাস্টারকে বিয়ে করলুম, তাতে কোনো দুঃখ ছিল না, কিন্তু সেও ভুগছে—রুগী স্কুলমাস্টার, এ আমি মেনে নিতে পারছি না কিছুতেই—হায়, পান্নালালেব সঙ্গে কেন আমার মিলন হ'ল না।" বিচারের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ আছে দেখে ঝুনুদির জন্যে অদ্ভুত sympathy বোধ করি—তার কিছু ছুঁতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু হাত দিয়ে স্পর্শ কোন স্পর্শ

নয়—হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় কেবল পরের জিনিশ—এমন সময় আশাতীতভাবে তার নগ্ন আমার নগ্নে লেগে যায়

বৃন্দাবন মল্লিক লেনের মুখে একটা ছোট দরজা দিয়ে মাথা নিচু করে ঢোকার সময় ঝুনুদি আমাকে বলে, "আমার সঙ্গে আসছো. কেউ যদি ছাখে?" পিছন ফিরে দেখি ট্রাফিক-আইল্যাণ্ডে ৪।৫ জন যুবা জটলা থামিয়ে আমাদের ঢুকতে দেখছে—কিন্তু আমরা তাদের চিনিনা বা তারা আমাদের

করিডরে আলো ও অন্ধকার দুই-ই রয়েছে—আলো ও অন্ধকার পেরিয়ে আমরা বাঁ-দিকের একটা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে X-RAY PLANT থেকে নীল আলো জ্বলে ওঠে—প্লান্ট থেকে চাপা আলো ও ক্রুর গুঞ্জনে ঘর ভরে যেতে থাকে—ঘর কাঁপতে থাকে—প্লান্ট কাঁপতে থাকে—খবরেরকাগজ-গোঁজা একটা ফুলদানি কাঁপতে কাঁপতে টেবিলের এ-দিক থেকে ও-দিকে চলে যায় ও কাৎ হয়ে কাঁপে

ডাক্তার নেই; ডাক্তারের শূন্য চেয়ারের পাশে প্লান্টের বিচ্ছুরিত শোভার মধ্যে আমরা মলিন ধুতি ও শার্ট পরা কম্পাউণ্ডারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি; পেশেণ্টদের দিকে ডাক্তারের স্টেথিশকোপ এক-হাতে দুলিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে চাপাস্বরে সে বলছে, "লিবিডো! লিবিডো! পেশেণ্টস হু আর ডাইং অফ একসেসিভ মাস্টার্বেশান—" রুগীরা বিক্ষিপ্তভাবে মেঝেয় বসে—তাদের কেউ কেউ উঠে দাঁড়ায়—টিকিটের লাল-নীল কাউণ্টারফয়েল হাতে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের দিক থেকে জুতো ঘসটানির শব্দ—সমবেত রুগীদের একসঙ্গে হঠাৎ দেখলে কে বিশ্বাস করবে যে এরা সকলে একই দেশের বা এক-পৃথিবীর

কেউ আমাদের লক্ষ্য করে না; একটা অন্ধকার কোনে তক্তাপোসে ঠেস দিয়ে ঝুনুদি বসে—আমি দু'হাত দিয়ে তার অঙ্গ সংবাহন করতে থাকি দ্রুত—বুক পিঠ ঘাড় হাত কিছুই আমার পছন্দমত হয় না—ওপর-হাতটায় দেখছি মাংস নেই—শুধু সরু ও

লিকলিকে একখণ্ড হাড—সবটাই deformed—এ কা, এখানে, পিঠে, কুঁজ কেন! কিন্তু ঝুনুদিকে তবে আমার বরাবর অত ভালো লাগত কেন—আমি নিশ্চিত জানি কিছু ভালো আছে কোথাও কিছু ভালো আছে ঝুনুদির—এমন সময় তাকে উল্টে তার নিতম্ব আমি পাই; আ, যা চাইছিলুম! দু'হাত দিয়ে তার নিতম্ব আমি উপভোগ করতে থাকি—তার নরম, তার গোলাকার, তার পালিশ, তার firmness, তার পিছল আলো দু'হাত দিয়ে ভোগ করতে করতে আমি বলি, "আমি জানতুম তোমার কিছু ভালো আছে" শুনে ঝুনুদি নারীর পরিতৃপ্ত ও গভীর নিশ্বাস ফ্যালে

এ-সময়—তাকে আবারো উল্টে—ঘন ও কর্কশ চুলের মধ্যে সহসা তার প্রায় এক বিঘৎ পরিমান S-এর মত বাঁকা নাভি আমি দেখতে পাই—নাভির মরা মাংস—এমন অশুভ নাভি আমি আগে কখনো দেখিনি কোনো রমণীর—এদিকে আমার দেরি দেখে ঝুনুদি অধৈর্য হয়ে পড়ে—অন্ধকারে পার্শ্ববর্তিনী প্রৌঢ়ার পায়ে পড়ে বলে, "ওগো শোনো—ওকে বলো—" ঝুনুদির উদ্বেগ দেখে বিমর্ষ রঙে ভরে যেতে থাকে আমার মাথা—অনিচ্ছাসত্ত্বেও আরো একবার আমাকে কিছু করতে হবে আমি বুঝতে পারি

এমন সময় দেখি ওদিকে কিউবের মতো গরাদহীন বিশাল জানালার ওপাশে তিনজন রমণী করিডরের শেষে অন্য-এক দরজার সামনে ক্ষিপ্রগতিতে দাঁড়িয়ে—তারা এইমাত্র এলো—তাদের সামনের দরজাটা বন্ধ যা খুললে যে-ঘরে তাদের প্রবেশ করার কথা ছিল; তারা একজন pimp-এর সঙ্গে কথা বলছে যে তাদের এখানে এনেছে; তাদের চাঞ্চল্য দেখে বুঝি তারা বহুদূর থেকে ও অতি দ্রুতগামী যানে এসেছে—তারা কি সময়ের থেকে দ্রুতগামী কোনো যানে এসেছে অর্থাৎ কিছুটা আগে এসে গেছে যে জন্যে দরজা এখনো খোলেনি, নাকি, তাদের কিছুটা দেরি হয়ে যাওয়ায় দরজা বন্ধ হয়ে

গেছে আমি ঠিক বুঝতে পারি না—এ-পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবে জানা যায় না কিছুই—তবু তারা তাদের pimp-কে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে—উপর্যুপরি জেরা করে ঐ বিষয়ে জেনে নিচ্ছে যা জানার

এই সময় সহসাই আমার মনে হয় হয়ত আমি স্বপ্ন দেখছি—এ কী, তবে তো অতি কাছাকাছি আমি এসে পড়েছি কোনো আবিষ্কারের—জানালার ওপাশে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনজনের মুখ—তিনজন রমণী ও একজন দালাল—এই প্রথম আমি স্বপ্নে তাদের মুখ দেখতে পাচ্ছি জাগরণে যাদের কখনো দেখিনি—তাদের অবয়ব দেখা গেছে—কিন্তু জাগরণের জীবনে অদেখা মানুষের মুখ এর আগে কেউ কখনো দেখেনি কোনো স্বপ্নে—পাশবিক অনুপ্রেরণায় আমি মাটি খুঁড়তে থাকি—তারাও মুখ ফিরিয়ে নেয় না—তাদের ভালো করে দেখে নিতে দেয় ও আমাকেও যা দেখার দেখে রাখে—তাদের মুখ এমনভাবে পুঁতে নিতে থাকি মনে—এমনভাবে—যেন জেগে উঠে কখনো দেখা হলে তৎক্ষণাৎ তাদের মুষ্টি চেপে ধরতে পারি—যদি তা পারি—যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি বুঝতে পারি কোনো-একটা আবিষ্কারের একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছি আমি—আমার শরীর ঝুঁকে বেঁকে যেতে থাকে আবিষ্কারের দিকে

বুকের ভিতর থেকে অনেক দিনের গোটানো একটা ছোট শাদা ফ্ল্যাগ টেনে বের করে খুলে সেটা নাড়তে নাড়তে স্ত্রীলোক-তিনটির দিকে আমি এগোতে থাকি…

রূপালি পর্দায়

পোল নদীর ও‍পর কিন্তু খালপোলের মত ছোট : পোলের ওপর থামের পাশে চামেলি বাস স্টপ-এ—পোলের ওপর ঠেলাগাড়ি, রিক্সা, অসম্ভব ভিড ও জ্যাম-এর ভিতর দিয়ে ডাবলডেকার যাচ্ছে স্লো স্পীড-এ —হর্ণ টিপে-থাকার একটানা ভোঁ—ঘণ্টার ওপর হাতুড়ি পড়ার শব্দ ক্রমাগত—ঠেলাগাড়ি রিক্সা ভিড—ভ্রাম্যমান গরুর পালের সমবেত ঘণ্টাধ্বনি—ঠেলাগাড়ি রিক্সা ভিড ও স্লো ডাবলডেকার—বেহালার ছড়কে চাবুক হিসেবে ব্যবহার—লাল বাস স্টপ-এর নিচে চামেলি থামে সেঁটে দাঁড়িয়ে—"দাঁড়াও যাচ্ছি" পোলের নিচে দাঁড়িয়ে আমি বলি : সে এমন ভঙ্গি করে যেন দাঁড়াবে—তার কথা শুনতে পাই না—তবুও সে তাড়াতাড়ি তার কাছে যেতে বলে মনে হয় : উঠতে গিয়ে একটা পাহাড় অতিক্রম করতে হয়—পাহাড়ে চড়তে দ্বিধা হয় না—সন্দেহ হয় না পাহাড়কে যদিও তার অস্তিত্ব কল্পনার বাইরে ছিল—কিন্তু তা পেয়ে সন্দেহ হয় না বা আশ্চর্য হই না—কারণ পাহাড় অজানা ছিল সত্যি কিন্তু এখন দেখছি পাহাড় আছে আর আছে-কে সন্দেহ করার কোনো মানে হয় না—সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ে চড়তে থাকি দ্রুত ; ছোট পাহাড়—চূড়াটা বেশ একটা মাঠের মত—আতা-বন সেখানে—বনের দিকে চেয়ে আমি ডাক দিই : "এএএএ কালুয়া !"

বনেব ভিতব গাছপালা নডেচডে ওঠে—গাছ থেকে নেমে বন কেটে বেরিযে আসে হাজারীবাগের কালুয়া—একটা মস্ত বড আতা—প্রকাণ্ড—বাতাবী লেবুর মত বড—আমাকে দেয়, আমি চামেলিব জন্যে পয়সা দিযে কিনি ; তরতর করে পাহাড থেকে নেমে আসি—দেবি না হয়ে যায়। সব মিলিয়ে ১০-মিনিটও লাগেনি—নেমে থামেব পাশে গিয়ে দেখি—চামেলি নয়—একজন প্রৌঢা দাঁডিয়ে আছে—আমি একবাব দেখেই চোখ ফিবিয়ে নিই—যাকে আমাব একবাব মনে হয ২০ বছর আগে ৩১-বছবেব চামেলির মত দেখতে ছিল ; ইতিমধ্যে ২০ বছব কেটে গেছে এমন সন্দেহ আমাব একবারো হয় না : চৌধুবিবাবু ভিড থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বলেন, "হ্যাঁ চামেলিকে দেখেছিলুম"—তাবপব অন্যান্য মেযেদেব গল্প দ্রুত কবতে থাকেন—আমার শুনতে ভালো লাগে না অন্যান্য মেযেদেব গল্প—"অন্যান্য মেয়েদের গল্প আমি শুনতে চাই না" একথা তাঁকে বলতে পারি না—চাপে আমার বুক ফেটে যায—তাঁব কথা শুনতে শুনতে ভিডের ভিতর থেকে তাব্র ও জলভবা চোখে চামেলিকে খুঁজে বার করতে থাকি—

সে চলে গিয়েছে আমার বিশ্বাস হয় না।

একজন নিরুদ্দিষ্ট ও তিনজন এলেবেলে

"আর-এ! ঋষি না? ঈ-য়েস! হ্যাট্‌স রাইট।'—বাসে সামনের লম্বা সাটে দু'জন তরুণ যুবা ঈষৎ উঁচুগলায় কথা বলছিল; আমি তাদের সামনে হ্যাণ্ডেল ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে। একটু আগে তারা যখন উত্তমকুমার-ব্যাপারে বলছিল তখন বেশ-কিছুটা শুনেছিলুম। বস্তুত বলছিল একজনই, তার কোলে বই-খাতা, তার সম্পর্কে ৩-টে জিনিশ প্রথমতই চোখে পড়ে। ১, সে ছিপছিপে। ২, তার কোমরে বেতের জালিকাটা বেল্ট, যা পীড়াদায়ক নতুন। ৩, তার গোঁফ। কম লোককেই গোঁফ মানায়। তাকে মানিয়েছিল! কথা বলার সময় তার ঠোঁট ও জিভ বেশ রীতিমত কাজে লাগে দেখছি বা সে লাগায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘন চুলের সুন্দর গোঁফ নানারকম চেহারা নেয়। যেমন হাসলে হাসির সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, "সে কী।" বলার সময় অবলঙ রূপ নেয়।

"উত্তমকুমার দেখিয়ে দিল-লো, অ্যাঁ?" সে বলছিল, "ক-তো যে ফো-ওন হয়েছে তার ঠিক নেই। খ-বোরের কাগজে তো এ-ছাড়া কোনো ফো-ওনই নেই।"

সে আস্তে আস্তে কথা বলছিল, উচ্চারণ করে করে। যেমন 'একাউণ্টট্যাণ্ট' শব্দটা সে বলল, একা, উণ্ট এবং জিভ টাগরায় কয়েক-

মুহূর্ত রেখে, ট্যান্ট। যেন তিনটে শব্দ। আসলে তোৎলা; কিন্তু অনেকানেক তোৎলার মত হড়বড় করছে না দেখে ভালোই লেগেছিল। তোৎলামিকে সে প্রায় একটা বাচনভঙ্গিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। কস্ট-একাউণ্টট্যান্ট কথাটা বলার জন্যেই তাকে একাউণ্টট্যান্ট শব্দটা ব্যবহার করতে হয়। সে কস্ট-একাউণ্ট্যান্সি পড়ছে। সাইমন এ্যাণ্ড সাস্টার্স নামক ফার্মে ঢুকেছে। "এ-ছাড়া এম-কম আর ল-ও পড়ি।" এত-কিছু একসঙ্গে পড়ে কী করে, কে জানে। বেশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে মনে হয়। ল-কলেজ পেরিয়ে গেল, কই নামল না তো।

শ্রোতা যুবকটির পরণে শাদা ট্রাউজার্স ও শার্ট, পায়ে দানাপুরি। সে বেল্ট পরেনি। ফর্শা ও মুখ লম্বাপানা, তার কব্জিতে ঘড়ি ও অসম্ভব লোম। "অনেকে বলছে এটা নাকি প্রেস-এজেণ্টের কাজ," সে সংক্ষেপে বলল।

"কো-ওনটা বল্ তো?"

"উত্তমকুমারের এই হার্ট-এ্যাটাকটা। পার্বলিসিটি।'

"সে কী!"

"হ্যাঁ। একদিনের জন্যে বাঙলাদেশকে আর-কিছু ভাবতে দিলে না।" লম্বামুখের শ্রোতা-ছেলেটি বলেছিল। তাকে বেশ বুদ্ধিমান মনে হয়েছিল।

ভিড়ের মধ্যে থেকে ঋষি বেরিয়ে এল। হাসল। তার মুখখানা কচি। সেও ট্রাউজার্স পরে আছে, তবে পেনা মনে হয়, তার মাথায় দিন-পনেরর চুল।

"আয়, আয়। বহুৎ দিন হু-য়ে। তার পর? কী করছিস এখন বল্।"

"একটা স্কুলে হেডমাস্টারি করছি।"

"হে-এড মাস-টার?"

ছোট-ছোট ভ্রূ-ছটোকে ছটো ইনভারটেড কমার মত দু'চোখের

দু'পাশে টাঙিয়ে রাখল সে। গুডনেশ! এটাও স্টাইলাইজ করেছে দেখছি, এই তোৎলামির জন্যে ওর জ্র-দুটোর ঐ-ভাবে বেঁকে-যাওয়াকে। "হ্যাঁ।" ছেলেটি কাঁচমাচু হয়ে বলল, "একটা জুনিয়র হাই স্কুল।"

"জুনিয়র? হা-আই? স্কুল? সে তো ভালো। মাস-টাররা তো এখন অনেক পাচ্ছে," বলে সে পাশের বুদ্ধিমান বন্ধুটির দিকে চাইল। বন্ধুটি অনিশ্চিতভাবে হেসে ঘাড় নাড়ল।

"তার-পর? মাথা নেড়া কেন বল?"

"বাবা মারা গেছেন।" ঋষি বলে যাকে ডাকা হয়েছিল নিচু, ছোট গলায় সে জানাল।

"অ্যাচ্ছ্যা?" বলে, তৎক্ষণাৎ পরে, একেবারে তখুনি যুবকটি জিজ্ঞেস করল, "তারপর? আর কী খবোর ভাই?"

আর-কী বলবে! পুরোনো বন্ধুর এই মূঢ়তায় সে কি...কিন্তু এ-নিয়ে ঋষির কোনো দ্বিরুক্তি আছে বলে মনে হল না। সে কি সামান্যতম আঘাতও পেল না? ঋষি তেমনি অপ্রতিভ গলায় বলল, "আর কী।"

"তুই মায়রি ঠিক তেম্নি থেকে গেলি।" ঋষির কলেজফ্রেণ্ড নড়েচড়ে বেল্টের ক্রেস্টটা দু'আঙুলে সেণ্টারে আনতে আনতে বলল, "দ্বা-আরভাঙ্‌গা হলে সেই শেষ দেখা, অ্যাঁ? একদিন আয় না আমাদের বাড়িতে। গোবিন্দর কী খবোর রে?"

"কন? ডাক? টর?" সে উঠে পড়ল, "রোক্‌কে; চলি ভাই," বলল, "একদিন আয়, কেমন? ও, তুই তো যাসনি, না? টেবল-টেনিস খেলতে যাসনি? গো-ওবিন্দ গেছে। গোবিন্দকে জি-ইজ্ঞেস করে নিস," বলতে বলতে গ্রে-স্ট্রিটে সে নেমে পড়ল।

হেডমাস্টার ঋষি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অতি আন্তরিকভাবে চেঁচিয়ে বলল, "হোপ আই শ্যাল সী ইউ এ্যাজ দি এ্যাকাউণ্টটেণ্ট-

জেনারেল অব বেঙ্গল সাম ডে ইফ নট অফ ইণ্ডিয়া।" ভুল ইংরেজি আমি তবু অনেক সময় টের পাই না, কিন্তু কেউ কারেক্ট খাবাপ-ইংরেজি বললে আমার কানে বাজবেই। ওফ্, এটা আর আমার গেল না।

স্টপে পা ফাঁক কবে দাঁড়িয়ে ক্রেস্ট সেণ্টারে আনতে আনতে যুবাটি উত্তর দিল, "অ-তোটা বোলো না, অ-তোটা বোলো না।" বলে সে হাসতে লাগল। বারংবার ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার গোঁফও, হাসির তালে তালে। আমি ভাবলুম, সে ও-রকম কেন করল? সে কি ধরেই নিয়েছিল যে লেডিজ সীটে কেউ না-কেউ আছেই। ওদিকে সীটগুলো কিন্তু এখন বেবাক ফাঁকা। অন্তত লেডিজ সীটে কেউ ছিল না। আমি আর বেচু কলেজে ছিলুম আসোল বন্ধু। নেবুবাগানের আড্ডা ছেড়ে, সন্ধের ঝোঁকে, আমরা দু'জনে প্রায়ই মেয়ে দেখতে যেতুম রাসবিহারীতে। এক-একটা মেয়ে যেত, আর বেচু মন্তব্য করত, "৭০০ বেসিক, এ্যালাওয়েন্স নিয়ে কুল্যে হাজার।" কেউ-বা ১৫০ নম্বর পেত। মানে, এইট্টি টু টু'ফিফ্‌টি। মানে, কেরানী ছাড়া তোমার আর-কিছু জুটবে না।

ঋষি ও আমি শ্যামবাজার মোড়ে নামলুম। ঋষি রাস্তা পেরিয়ে বৃন্দাবন পাল লেনে ঢুকে গেল। বাগবাজারের ছেলে।

১, তোৎলা-র ডায়লগ, অনুগ্রহপূর্বক, যত্ন কবে দেখবেন।

২, 'আসোল' বানান ভুল লিখিনি।

ধলভূমগড়ের ব্যানার্জিবাবু

সেবারের শীতে আমরা ব্যানার্জিবাবুকে পেয়ে গেলুম, "একটা মেয়েছেলে যোগাড় করে দিন না, ব্যানার্জিবাবু ?"

বিকেলে ব্যানার্জিবাবু আমাদের ছেড়ে এগিয়ে যান স্টেশন-ইয়ার্ডের দিকে যেখানে কিছু কুলিকামিন কাঠ-চেরাইএর কাজ করছিল।

সর্দারকে ব্যানার্জিবাবু, "আচ্ছা, এখানে মজুর পাওয়া যায় ?"

সর্দার, "কাম কুথা হোবেক বাবু ?"

ব্যানার্জিবাবু, হাত তুলে, "ঐ ডাকবাঙলোয় কাম হবে।"

সর্দার, "কুলি দেড় রুপিয়া বাবু।"

ব্যানার্জিবাবু, গলা খাটো করে, "আর কামিন ?"

সর্দার, "কামিন এক রুপিয়া বাবু।"

ব্যানার্জিবাবু, "এক রুপিয়া ?" একটু ভেবে, "ঠিক আছে ! কামিনই রাখব।"

সর্দার, "কী কাম করতে হোবেক বাবু ?"

একেবারে অপ্রত্যাশিত, হঠাৎ বিষম রেগে গেলেন ব্যানার্জিবাবু, যেন ফেটে পড়লেন রাগে।

ব্যানার্জিবাবু, কেঁপে উঠে, "সব কাম করতে হবে," চিৎকার

করে, "হাঁ, সাব কাম!" মাটিতে স্টিক ঠুকে, "সাব—সাব কাম!!"

তাঁর চড়া গলা শুনে সর্দার চমকে ওঠে, আমরা হাসি চাপি ও উপস্থিত সাঁওতাল রমণীরা মুখ তুলে তাকায়।

ব্যানার্জিবাবু, "কাল চলে যাচ্ছেন শুনলাম?"

"হ্যাঁ, কাল।"

"ভোরের গাড়িতে?"

"হ্যাঁ, ভোরের গাড়িতে। কিন্তু," আমরা জানাই, "আজ রাতটা আছি।"

ব্যানার্জিবাবু, টেবিল থেকে একটা গ্লাস ছোঁ মেরে তুলে ধ'রে, "দা নাইট ইজ ইয়াং।" "দা নাইট ইজ ইয়াং", "দা নাইট ইজ ইয়াং"··· সমস্বরে বলতে বলতে সোনার নদীর মত আমরা ভেসে যাই ব্যানার্জিবাবুর দিকে। সহাস্যে। চুমুক দিতে দিতে।

ডাকবাঙলো থেকে বেরিয়ে আমরা রাস্তায় নেমে পড়ি, সঙ্গে ব্যানার্জিবাবু। পথে পড়ে ভাটিখানা। সেটা ছেড়ে আরো কিছুটা এগিয়ে আমরা একদল উজ্জ্বল মাতাল আগে আগে যাচ্ছে দেখতে পাই।

সহসা, ব্যানার্জিবাবু, "কুতা তেন হিজুতানা, হেএই!"

তোদের গাঁ কোথায় রে।

তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। আমরা তাদের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। তারা যাবে বুরুডি। আমরা কদ্দূর?

আমরাও যেতে পারি বুরুডি, ব্যানার্জিবাবু তাদের বলেন। যেতে যেতে আর-একটা ভাটিখানা পড়ে। সেখানে আমরা সবাই বসি।

সেখানে আমাদের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

আমরা আবার বুরুডির পথ ধরি।

ব্যানার্জিবাবু, একজনকে, "তা তোদের গাঁয়ে যে যাচ্ছি, ওখানে মুর্গি পাওয়া যাবে ?"

"হাঁ ? কেনো যাবেক নাই বাবু ?"

"বটে ! আর মদ ?" দু'দিকে মাথা নাড়িয়ে অবিশ্বাসীর মৃদু হাসি হাসতে থাকেন ব্যানার্জিবাবু।

মদ পাওয়া যাবে।

"আর মেয়এছেলে ?" হৈ হৈ করে হেসে ওঠেন ব্যানার্জিবাবু, "মেয়েছেলে, অ্যাঁ, মেয়েছেলেও পাওয়া যায় নাকি," দম ফেটে টুকরো হয়ে যেতে যেতে, "মেয়েঃ—মেয়েঃ—মেয়েছেলেও পাওয়া যায় নাকি বাবা তোদের গাঁয়ে ? এর্‌রে সমারু," একজনের পেটে স্টিকের খোঁচা মেরে, "মেএচেলেও পাওয়া যায় ? ওওওওহোঃহোঃহোঃহোঃহোঃহোঃ।"

যেতে যেতে বুরুডিহি পথ জুড়ে বিশাল চাঁদ উঠতে থাকে। অন্ধকার হাঁ থেকে চকচকিয়ে উঠতে থাকে, তাঁর, ব্যানার্জিবাবুর, দাঁতের সোনা।

উৎপল সম্পর্কে

পদ্মপুকুরে উৎপলের বাবার মৃত্যুর পরে-পরেই উৎপল বাড়িটা বেচে দেয়। দু'সারি পামগাছের মাঝখান দিয়ে গেট থেকে বেশ কিছুটা হেঁটে ঢুকতে হয় এমন অতবড় বাড়ি, যে বাবার শ্রাদ্ধশান্তির পর মাথার চুল গজাবার আগেই মাসখানেকের মধ্যে কী করে হস্তান্তর করা যায় তা আমি তখন ভেবে পাইনি। পরে শুনেছিলুম লাখখানেক টাকার বাড়ি বেচে-দেয় ৬০-হাজারে। তাহলে অবশ্য হতে পারে।

উৎপলদের পদ্মপুকুরের বাড়ি ছিল জিনিশ-পত্তরে ঠাসা। দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা ছিল অসম্ভব চওড়া, ঈষৎ ঘোরানো ও কাঠের, সাহেববাড়ির ধরণে স্টেপগুলো বাঁ-দিকের সরু থেকে ডান দিকের দেওয়াল পর্যন্ত ক্রমেই চওড়া হয়ে গেছে, একটা কাগজের চীনা হাতপাখা খুলে ফেললে যেমন, সিঁড়িগুলো ছিল অনেকটা তেমনি, অর্ধ-গোলাকারে ওপরে উঠে গিয়েছিল। আমি দোতলা পর্যন্ত উঠেছিলুম। সিঁড়ির রেলিং মনে পড়ে ও তার পালিশ, এ-সব রেলিং দু'বেলা মোছার জন্যে চাকর থাকে। দোতলায় উঠেই সিঁড়ির মুখে ছিল ছিপছিপে কালো একটা পিয়ানো, বাঁকা ও থাবাঅলা ছিল তার পায়া, সামনে একটা লম্বাটে রোগা চেয়ার। তার পায়াগুলিতে পিতলের উজ্জ্বল শু। তিনতলায় কী ছিল জানিনা,

তার কারণ আমি কখনো তিনতলায় উঠিনি। পিয়ানোর ক্যাবিনেটটার গায়ে ছিল পিতলের ফলক, কোম্পানীর নাম মনে থাকার কথা না, London W-10, এটা স্পষ্ট মনে পড়ে। ক্যাবিনেটটা ছিল ওক কাঠের, উৎপল বলেছিল। ওক, বীচ, এল্‌ম্‌, বার্চ…'ছেলেদের ভূগোল' থেকে পরপর মনে পড়ে যায়। এ ভাবেই মনে পড়ে পারপিচুয়াল স্নোলাইন বা গর্জনকারী চল্লিশা। অরোরা বোরিএলিস।

পিয়ানো বাজাতেন উৎপলের মা। তাঁকে দেখিনি; একবার স্বপ্নে দেখেছিলুম ঐ পিয়ানোর অফুরন্ত ড্রয়ার আমি খোলাবন্ধ করছি, খালি উৎপলের মার দামি দামি জামাকাপড় সব—স্টোল, শাল, শাড়ি…এ-সব টেনে বের করে দোতলার লাল মেঝের ওপর জড়ো করছি, আমরা টাকা খুঁজছিলুম। পাশে দাঁড়িয়ে উৎপল বলে দিচ্ছিল। এটা স্বপ্ন; ঠিক যেমন এটা স্বপ্ন নয় যে পরলোকগত বাবার ইন্‌সেট সিন্দুক থেকে বোতলের পর বোতল বের করে উৎপল আমাদের বীয়ার খাইয়েছিল।

উৎপলের মা যখন মারা যান উৎপল তখন হাফপ্যাণ্ট পরে, শ্রাদ্ধ হয়েছিল বহরমপুরে। মাইল-২০ দূরের একটা হাট থেকে বৃষোৎসর্গের জন্যে কেনা হয় একটা বাচ্ছা ষাঁড় ও উৎপলের মামা ব্যস্ততার জন্যে তাকে ও উৎপলকে একটা লরিতে তুলে দেন। বহরমপুর পর্যন্ত তরুণ ষাঁড় ও তার গলার দড়ি ধরে নেড়ামাথার বালক উৎপল ছুটন্ত লরিতে বসে থাকে, রাস্তা ফাঁকা, হু-হু হাওয়া শীতের, ষণ্ডশাবকটি ছিল আবার অসম্ভব স্বাধীনতাপ্রিয়, ফলে শেষ পর্যন্ত খোলা ও ছুটন্ত ট্রাকে তার গলা ধরে উৎপল ঝুলে পড়ে ও শেষাবধি আহত অবস্থায় বহরমপুরে পৌঁছয়। সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন এই গল্পটি উৎপলের দাদার মুখে শুনে খুব হেসেছিলুম মনে পড়ে।

উৎপলের বাড়িতো ছিল ঐ-রকম, জিনিশে ঠাসা। ঐ সিঁড়ির ডানদিকের দেওয়াল জুড়ে নানা ট্যাক্সিডার্মি, মাঝে মাঝে বেশ বড়

সাইজের কয়েকটি আয়না। সিঁড়ির আয়নাগুলোর মধ্যে শুধু একটাই ছোট আয়না ছিল, সেটা ছিল ওভাল, তুলনাহীন যৌন আবেদনে ভরা তার ছানার জলের মত নীল কাচ ও শাদা ফ্রেম মনে পড়ে।

দোতলার প্রশস্ত বেডরুমে প্রকাণ্ড খাটের পাদদেশ জুড়ে দেয়ালে-গাঁথা আয়না। চামেলির কাকাবাবুর ঘরেও এ-রকম দেখেছিলুম, খাটের পায়ের দিকে ঐ-রকম ও এপাশে-ওপাশে দেওয়াল জুড়ে আয়না। আমাদের আগেকার বাঙালি বড়লোকেরা, বিশেষত কলকাতার কায়েত ও বেনে, এঁরা বেশ কামুক ছিলেন মনে হয়, যা ভাবতে ভালো লাগে। উৎপলের বাড়ির মস্ত ও চকচকে বাথরুমে ঢুকে দীপক বলে উঠেছিল, "বাঃ, খাশা বাথরুম তো হে তোমার।" আমারও অনুরূপ মনে হয়েছিল। তবে খাশা ও হে-সহযোগে আমি তা বলতে পারিনি।

মোটকথা উৎপলের বাড়িতে ছিল ঐ নীরব পিয়ানো যা ছিল ওক-কাঠের, ও……লিমিটেড, লণ্ডন, ডাবলিউ টেন-এ তৈরি। এ-ছাড়া ছিল অজস্র আয়না। যেমন উঁচু দেওয়ালে থাকে অসংখ্য পোস্টার। বা, চুনারে যেমন দেখেছিলুম ইতস্তত কবর; রিনা ও আমি পৌঁছই বিকেল-বেলা, মথুরাপ্রসাদ কেশ্‌রীর বাড়ি পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যায়। পরদিন ভোরে উঠে দেখি বাড়িটি গঙ্গার ধারে ও তার খিড়কিতে একটি কবর, ১৮৬২ সালে ইটালিয়ান সাহেবের তৈরি কুয়ার পাশে একটি ও গেট পেরুলেই ডাইনে-বাঁয়ে একটি করে। বাঁ-দিকেরটি ছিল জিন্দা-পীরের কবর, পীর সুলাইমানি, পূর্ণিমারাতে ঐ পীরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়। কার্তিক-পূর্ণিমায় ওখানে ছোট মেলা হয়, যখন মধ্যরাতে এক সময়, কোনো-এক সময়, কবরের ভেতর থেকে ভেসে আসে বাজনার শব্দ

রিঙ্কিঝিনি, রিঙ্কিঝিনি
রিন্‌কঝিনি রিন্‌কঝিনি রিন্‌কঝিনি
রিঙ্কিঝিনি…

সবাই শুনেছে। বস্তুত চুনারে কবর সর্বত্র, নুড়ির মতন ছড়ানো, গদা পাহাড়ে উঠে দেখি সেখানেও কবর, গদা-বাবার। তেমনি ছিল আকস্মিকতায়-ভরা সব আয়না, উৎপলের বাড়িতে। বালুয়াঘাটে সাহেবদের গোরস্তানও দেখেছি, সেও গঙ্গার ধারে, পাঁচিলে-ঘেরা, এপিটাফে-এপিটাফে ভর্তি; সে-রকম দোকানের মতন নয় ঠিক।

বাড়ি বিক্রীর আগে উৎপল সব জিনিশ একদিন সকালে বেচে দেয়। সকাল থেকে ৪।৫ জন লোক এল। কেউ এসেছিল আসবাবপত্র কিনতে, কেউ পাখাগুলো কিনবে বা ইলেকট্রিক্যাল জিনিশপত্র—এ-রকম। উৎপল একজন লোককে বলল, "সব-জিনিশ দেখে এসে দাম বলুন।" ভদ্রলোক ২।৩ ঘণ্টা ধরে সব জিনিশ দেখে এসে দাম বললেন। লিস্ট না ছুঁয়ে উৎপল তৎক্ষণাৎ ৩০০ বেশি চাইল ও ভদ্রলোকও পর-মুহূর্তেই রাজি হয়ে গেলেন। কেন ৩০০, আমি তখন বুঝতে পারিনি। মোটিফ কী? পরে ফ্ল্যাটের জন্যে উৎপল ৩০০ টাকা দিয়েই একটি সোফা-কাম-বেড কেনে। এতে শক্তি ক্ষুব্ধ হয়েছিল খুবই। সে রাগ করে উৎপলকে বলেছিল, "ছ্যা ছ্যা উৎপল, তুই বাড়ি বেচে একটা বেঞ্চি কিনলি?" উৎপল কেন ঠিক ৬০-হাজারেই বাড়ি বিক্রী করেছিল, আমি তা' জানিনা। ক্রেতা-ভদ্রলোক অবশ্য ক্ষীরোদ মার্কেটের ওপর উৎপলকে একটি এ্যাপার্টমেণ্ট দেখে দেন ও মোট ৭-মাসের ভাড়া অগ্রিম মিটিয়ে দেন। কেন ৭ মাস, ফ্রাংকলি, জানিনা। উৎপল তো দেড় বছর পরে বিলাত গিয়েছিল।

হাংরি জেনারেশনের ছেলেদের সঙ্গে ফোটো তোলার অপরাধে উৎপলের চাকরি যায়। "আপনি মেয়েদের কলেজে অধ্যাপনা করার অনুপযুক্ত," এই চিঠি উৎপলের এলিয়ট রোডের ফ্ল্যাটে ওর দাদাদের হাতে হাতে ঘুরছিল। ওঁরা বেশ এশট্যাবলিস্‌ড ও ইনফ্লুয়েনসিয়াল, দাদারা, নিউ আলিপুর-টুরে বাড়ি, গাড়ি করে এসেছিলেন। ওঁরা ছোট ভাই-এর জন্যে কিছু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উৎপল, "এ নিয়ে

আর কিছু করার নেই”, বলে হেসে হাত নেড়ে দেয়। ওঁরা এক এক করে উঠে যান। ওঁরা একটু একটু করে কেরিয়ার করেছেন, একজনের কেরিয়ার এ-ভাবে ওয়াশড-আউট হয়ে যাচ্ছে অথচ সে দ্বিরুক্তিহীন— এতে ওর দাদারা স্পষ্টতই অবাক হয়ে যান। দাদারা চলে গেলে উৎপলই এই মন্তব্য করে। সম্প্রতি ‘বাংরি’ জেনারেশন নিয়ে জ্যোতি একটু ব্যারিস্টারি করেছে দেখলুম। তখন করলে পারত জ্যোতি, বা আমরা উৎপলের বন্ধুরা উৎপলের জন্যে কিছু করলে পারতুম, যারা, উমম্‌ম্‌···পাখি বা আস্তাবল না, তার বর্ণনা যারা পছন্দ করি, সমুদ্র-তীর সম্পর্কে ছাপা অক্ষর যাদের ভালো লাগে। সমুদ্র না।

বলা বাহুল্য এ-জন্যে উৎপলের মনে কোনো মালিন্য ছিল না, আজ আর আমাদের মনেও কিছু নেই। বন্ধুরা সকলেই জানে, চাকরি যাবার পরেই উৎপল ছোটায় সেই ফোয়ারা যার নাম ফুর্তি, সে যে এতবড আমোদগেঁড়ে, তা চাকরি যাবার আগে আমরা জানতে পারিনি।

উৎপলের মনে কোনো হিংসে ছিল না। অভিমান ছিল না। রাগ ছিল না। কোনো গ্রাজ ছিল না। বস্তুত হয় সে নিজে মানুষ ছিল না, নইলে সে কাউকে মানুষ মনে করত না, কেননা, তার সামনে কোনো মানুষ ছিল না এটা বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। শুধু একবারই দেখেছিলুম উৎপলকে রেগে যেতে। যোধপুর পার্কে মঞ্জুশ্রীর বাড়ি থেকে ফেরার সময়, হঠাৎ উৎপল ট্যাক্সি ছেড়ে তরতর করে উঠে গিয়েছিল নির্মীয়মান একটা স্ক্যাপারের ছাদে, মধ্যরাতে চাঁদের আলোয় বেল্ট খুলতে খুলতে হাউস-টপ থেকে চিৎকার করতে করতে সে বারবার করে বলেছিল, “চারদিকে এত বড় বড় বাড়ি, এ সব কাদের? পয়সা কোথায় পেলে বো* *দারা?” এত জোরে চিৎকার করেছিল উৎপল যে আশপাশের বাড়িতে টক টক করে আলো জলে উঠেছিল। আমাদের দমদমের ফ্ল্যাট থেকে দিগন্ত পর্যন্ত

দেখা যেত সারি সারি হাউসিং স্কীম। অদ্ভুত, থ্যাঁতা, হিংসুটে, রক্ত-মাখা, চাপা গলায় উৎপল আমাকে বলেছিল, "এইসব স্কীম দেখলে আমার মনে হয় দুউম্ করে একদিন পুরোটা ফেটে যাবে।" "এ্যামাউন্ট অফ কোরাপসান ছাড়া কোনো সাকসেস হয় না," এটা কে বলেছিল, উৎপল না তন্ময়? আমার কথাটা মনে আছে।

বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, উৎপল গ্যারাজে থাকত। একদিন গ্যারাজ থেকে, একের-পর-এক বাথরুম পর্যন্ত আলো জ্বালিয়ে ওর বাবাকে বাথরুমে যেতে দেখেছিলুম। ভদ্রলোকের পেটে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হয়, দ্রুত মারা যান। দেবেন্দ্রনাথের মত নাকি দাড়ি ছিল উৎপলের বাবার, তাঁকে চোখে দেখিনি, শুধু তাঁর কাশি শুনেছি। বায় দা ওয়ে, কেউ যদি রবীন্দ্রনাথের কাশি শুনতে চান তো মেগাফোন রেকর্ডে কবিকণ্ঠের বীরপুরুষ আবৃত্তি শুনবেন, পাঠ হয়ে যাবার পর দু'বার ঘনঘন শোনা যায়।

মৃত্যু সম্পর্কে

মৃত্যু-সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য এই হতে পারে যে, ১, তা এক আক্রমণ। ২, অতর্কিত বটে, তবে গোপন নয়, আগে থেকে ঘোষণা করা হয়। ৩, একসঙ্গে সকলের মৃত্যু কখনো হতে পাবে না। মৃত্যু এক এক ক'রে, একবারে মাত্র একজনকে, আক্রমণ করে। সকল মানুষকে একসঙ্গে পরাস্ত করার ক্ষমতা মৃত্যুর নেই।

এ বড অসম যুদ্ধ, আমি বলব। অসুখ হয়; সেরে উঠে অনেকে ভাবে, 'বাঁচলুম।' হেসে তাকে বলার, 'এটা ভুল।' মৃত্যু থেকে কেউ কখনো বেঁচে ওঠে না। তবু অন্যান্য মানুষদের নিয়েই আমাদের জীবন, ভাবি আমরা একসঙ্গে বেঁচে আছি। অথচ 'কোথাও যাচ্ছিনা' ভেবে বাড়ি থেকে বেরনো চলে না বলেই আমরা কোথায় যাচ্ছি ভেবে নিয়ে চিরকাল বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, চুপ করে গেলে আমাকে লক্ষ্য করা হবে বলে কথাবার্তা বলে গেছি। আমরা কেন একা-একা ঘুরি না? একজন লোক ভিড়ের মধ্যে পড়ে যায় বলেই সকলে ঘাড় ফিরিয়ে ছাখে। জানি, আজকাল মানুষের সম্মান-করার ক্ষমতা অনেক বেড়ে গিয়েছে, কেউ বলে না, 'আহা।' তবু এই দেখাটুকু কত অশ্লীল!

এই জন্যে সময় থাকতে deliberately একা হয়ে যাওয়া উচিত।

বড় ও ফাঁকা মাঠ একা পেরনো উচিত প্রায়ই। সকলে যদি এইভাবে নিজেকে single-out করে নেয়, তবে কারুকেই আর ভিড়ের মাঝখান থেকে তুলে নিতে হয় না। মাঠের মাঝামাঝি পৌঁছলেই ছুটে এসে ঢেকে ফেলবে ঘুরন্ত লাল, ধুলোটএর পরে কেবল স্থানটুকু পড়ে· থাকবে।

এক এক করে ও একা একা সকলের মাঠে চলে যাওয়া উচিত। অনিচ্ছুক হয়ে লাভ কী? আমরা নিজেদের সজ্জিত করেছি। অতর্কিত আক্রমণ আমরা এড়াতে চেয়েছি। আমরা চাইনি কেউ আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় পায়। কেবল এইজন্যে আমরা নিজেদের dignified করে রেখেছি। দাড়ি কামিয়ে গেছি প্রতিদিন। আমাদের মাঠে ডাকা হোক। আমবা ইচ্ছুক।

একতলার বাথরুম থেকে শেফালীর সাবান কে মেখে গেছে? ক্ষয়ে গেছে তার সাবান। 'ছিঃ ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ,' রামবাগানের বাথরুম থেকে ঘৃণায় শেফালী থুতু ছিটোচ্ছে উত্তরে, দক্ষিণে, চতুর্দিকে। 'এ কি প্রবৃত্তি!' শেফালী চেঁচাচ্ছে তারস্বরে।

কেবল মুহূর্তের মৃত্যু, কেবল মুহূর্তের মৃত্যু, এই আমাদের জীবন। তবু মনে হয়, মৃত মুহূর্তগুলি প্রবালের মত কণায় কণায় জমে উঠছে কোথাও, জলের ভিতর থেকে জল ছিঁড়ে ডুবো পাহাড়ের মত জেগে উঠবে একদিন, বারিপাতহীন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের শুষ্ক, শূন্য রাত্রি যখন বিদ্যুতে-বিদ্যুতে দিন হয়ে যাবে, সেই অলৌকিক দিনের বেলায়, আমার এ-রকম বোধ হয়, আমরা সকলেই দেখে যেতে পারব সেই চড়া সেই মৃতমুহূর্তের পাহাড়, মৃত্যুর শিখর, আমাদের

অভিজ্ঞতার অবয়ব। তার জাগরণ।

হো হো করে হেসে উঠতে কি জোরে হেঁটে যেতে আমি কখনো পারিনি। কারণ আমি তাকে ভুলে গেছি যেই, অমনি সে, কিছু করেনি, আমার চেয়ে একমাত্র পরাক্রান্ত সে, কেবল আমার কাঁধে হাত রেখেছে। আমি হয়ত চন্দ্রকোষ শুনছিলুম। 'ভালো?' কাঁধে হাত রেখেছে সেই ইয়েতি। 'যাও, এখন কী, এখন গান হচ্ছে' বা, 'চোপ্‌রও, এখন আমি চুম্বন…' মৃত্যুকে এ-কথা আমরা কোনোদিন বলতে পারিনি।

মাঝে মাঝে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।

ঠিক সময়ে সাবানের বিজ্ঞাপন জ্বলে উঠলে, মাঝে মাঝে, টু-বি বাসের আপার ডেক থেকে ও হূ-হূ হাওয়ার মধ্যে

চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল
(Extn.)

এই বিজ্ঞাপন পাঠ করি।

অধিকাংশ লোক চায় আরো ভালো-করে বেঁচে থাকতে। মানুষের মধ্যে আজ শুধু এদেরই বলা যেতে পারে অভিজাত মানুষ—মার্কসবাদী, মালিক, পুঁজিবাদি, শ্রমিক, ভণ্ড, সাধু, মিস্টিক, এগজিস্টেনসিয়ালিস্ট, ভীত, মদ্যপ, পরাজিত, বেশ্যাসক্ত—(মোট ৯১১-রকম)—এদের সকলকেই, এদিক থেকে, একই নিঃশ্বাসে অভিজাত বলা চলে। বস্তুত

bar-এ যাওয়া সাহেব সেজে বল-ড্যান্সে যাওয়ার মতই হাস্যকর তথা imperialistic মনে হয়।···আমরা স্বল্পসংখ্যক লোকই শুধু চিরকাল থেকে আজও অনভিজাত থেকে গেলুম।

আমরা যারা চিরকাল গরীব, তারা গরীব শুধু এই কারণে যে, শুধু বেঁচে-আছি বা শুধু-বেঁচে-থাকাতেই আমরা তাজ্জব তথা মুগ্ধ। প্রতিদিন মলত্যাগ করেই আমরা মুগ্ধ বা প্রস্রাব করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের সকল ভার নেমে যায়। যৌনতা-ব্যতিরেকে আজ আমরাই বাঁচতে পারি, স্ত্রীর পিরিয়ডের হিশেব আমরা গরীবেরা রাখি না।

এ ছাড়া আমাদের খিদে পায় ও না খেলে আমাদের চলে না এবং প্রস্রাব ও বাহ্যে অবশ্যই হওয়া চাই। অতএব জঠরের ক্ষুধা, বাহ্যে ও প্রস্রাব—এই ত্রয়ীর পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা গরীবেরা পৃথিবীর অভিজাতদের স্পষ্ট ও নির্বিশেষভাবে চিনে থাকি। এইজন্যই আমরা প্রতিটি মলত্যাগে এত মুগ্ধ, ক্ষুন্নিবৃত্তিতে সুখী ও প্রতিবার প্রস্রাব করে এসে এমন নির্ভার। শেষ ফোঁটাতক প্রস্রাব ঝেড়ে প্যান্টের প্রত্যেকটা বোতাম আঁটতে আঁটতে পাবলিক ইউরিনাল থেকে বেরিয়ে আসে যে পরিতৃপ্ত যুবা, তার মুখে যৌনতা দেখি না।

মৃত্যু দেখিনা। মালিকশ্রেণীর এ কোন পৃথিবীব্যাপী চক্রান্তের ফলে অই প্রিয় যুবা ধরে নিচ্ছে যে সে শেষবার প্রস্রাব করে আসেনি? তার আবার প্রস্রাব হবে কি?

বহুকাল পরে উঠেছি এ-রকম শেষরাতে; ঘুম ভেঙে যেতে প্রথমেই রিনা ও মেয়ে শুয়ে আছে দেখতে পাই এতে আশ্চর্য হইনা; ঘরে সবুজ আলো, আগাগোড়া শাদা মার্বেলের আধুনিক প্রাসাদ, লাল স্টীলের জানালার আর্চ দিয়ে মশারীর ভেতর থেকে ঘুমঘোরে চাঁদ দেখে এও স্বাভাবিক মনে হয়; আরো ঘুমোতে ইচ্ছা হয়; শুধু 'আরো প্রগাঢ়

ঘুমোতে পারব' এই যুক্তি বাথরুমে যেতে বলে, ঘরের দরজা খুললে বাইরে উঁচুতে বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে, রাস্তার ইলেকট্রিক তারে শর্ট-সার্কিট মনে হয়···ক্রমে ছাদের দরজা সশব্দে খোলা-বন্ধ হবার শব্দ পাই, আলো জ্বালাতে জ্বালাতে একা ছাদে উঠে যাই যে-কোনো অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে, ওপরে উঠে দেখি সিঁড়ি আরো উঠে গেছে, উঠে ভেঙে গেছে ; ছাদের দরজা হা হা করছে, বিদ্যুতের ঘন ঘন আলোয় তার খোলাবন্ধ সহসা দেখে আজ শেষরাতে সর্বহারা মানুষের কথা মনে পড়ে যায়—প্রাণছাড়া যার হারাবার কিছু নেই।

বাড়ির ওপরের আকাশ দিয়ে অদ্ভুত আঁধারের দিকে রোজই দু-এক ঝাঁক টিয়া উড়ে যায়। কলরব ঝ'রে পড়ে। আমাদের বাড়ির সবুজ পাখিটির উত্তেজনা ক্রমশ কমে আসছে। আজকাল সে কেবল মুখ তুলে চায়, উত্তর দেয় না। শুধু তার ঘনসবুজ পাখনাদুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে, পিতলের ঘুরন্ত দাঁড়ে সে আজকাল অতি ধীরে হাঁটে। তার পায়ে উজ্জ্বল শিকল।

কয়েকটি শিরোনামা ১

আমার ক্ষমাহীনতা

বারীন রয়েছে হাসপাতালে, তাকে দেখতে গিয়েছিলুম। ঢোকার সময় দেখে যাইনি, আওয়ার্স শেষ হলে বাইরে বেরিয়েই দেখি আঁধার ; ও জনস্রোত একসঙ্গে দেখে আমার মনে পড়ে জানাবার কিছু নেই, সকলেই জানে যা জানার, ভালো করে চেয়ে একবার দেখলেই সব জানা যায় ; এ-ফুটপাত থেকে ও-ফুটপাতে চলে যাচ্ছে দলবদ্ধভাবে মানুষ, কেউ একা হাঁটছে না, তারা এত মুহুর্মুহু রাস্তা cross করছে কেন, কেন তারা ভুলেও থামে না, কেন এ-গলি দিয়ে ঢুকে পড়ে ও-গলি দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে—গলির মুখ থেকে পাঁচ-জোড়া মুণ্ডু বের করে দু'দিক দেখে নিয়ে কেন তবে সেনট্রাল এ্যাভিন্যুএ পা দেয়? সকলেই সকলের আগে যেতে চায়। কেন?

এ কি নয় আঁধারের অনুসরণ?

বারীনের বোনও গিয়েছিল হাসপাতালে। তাকে শেষ যখন দেখি সে ফ্রক পরত। আমি তাকে বলি [তার নাম জানি না], "চলো, তোমাকে পৌঁছে দি।" কেউ কি শুনতে পায়? নাঃ। আজকাল সকলেই কিছু না-কিছু বলছে, আমিও তাদের শুনতে পাই না। এ বয়সে ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশান হলে সব দেশেই মোট আয়ু দাঁড়ায় আর ৬-সপ্তাহ, বারীন আর ৩-সপ্তাহ বাঁচবে। আমি, "একটা

নতুন ওষুধ এসে পড়ার কথা আছে” বললে ভর্ৎসনা করে বারীন আমাকে বলে, “সান্‌তোনা দিচ্ছিস?” বলে সে একদম চুপ মেরে যায়।

একটা রিক্সা ডেকে তাকে উঠতে বলি। সে ওঠে, সব জেনে। কেউ কেউ চুলও বাঁধে, সব জেনে। শীতকাল; যুক্তিসঙ্গত পর্দা ফেলে দিই। কেউ আমাদের লক্ষ্য করে না।

চামেলিকে আমি

“ছাখো, তোমাকে দেখেই তো আমার ভালবাসা জন্মায় নি, প্রথম দৃষ্টিপাতেই আমরা অনুরক্ত হয়ে পড়িনি। তবু তুমি কেন এত তাড়া-তাড়ি প্রেম জানাচ্ছ? আমাদের তো চেষ্টা করতে হবে পরস্পরের প্রেমে পড়তে, যদি আমরা তা পারি সেই হবে আমাদের প্রেম। আমাদের সময় লাগবে এবং সফল হব কিনা আমরা জানিনা। এ-ভাবে প্রেম না হলেই ছিল ভালো, তবু আমরা দু’জনে কাছাকাছি এসেছি কিছু আশা করে; আমাদের দু’জনেরই তা না-হলে আর চলে না বলে। কিন্তু আমরাই পরস্পরের প্রণয়পাত্র বা পাত্রী কিনা আমরা জানিনা। হয়ত আমরা নই। তবু একথা সত্য কিনা জানার চেষ্টা করব বলেই আমরা কাছাকাছি এলুম। তবে কেন তুমি এত passionately এগিয়ে আসছ, দ্রুত নিষ্পত্তি চাইছ কেন? Spare me so that I may not have to simulate warmer kisses of others…

“Let me kiss my own”, এই বলে তাকে আমি—

তার রূঢ় ঠোঁট!

একদিন বিকেলবেলা জেঁকে বৃষ্টি এসে গেল। সুধা শার্সিগুলো বন্ধ করে লেপের মধ্যে এলে তাকে জড়িয়ে ধরলুম। সুধা কাঁপতে ভালবাসত। সুড়সুড়ি দিতে বলত পিঠে।

বলল, "বেশ তো হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন পিঠে। কী হল?"

লজ্জা হয় তাকে বলতে, সেই নির্লজ্জাকে। তবু আপত্তি সে করতে পারে না। হায়, তার অধিকার নেই।...

চামেলির বিয়ে হয়েছিল কাছেই, তখন স্কুলমাস্টারি করত আলম-বাজারে, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের গরম চাতালে বসে দুপুরবেলায় তাকে প্রেম-নিবেদন করতেও খুবই লজ্জা হয়েছিল, ও ৮-বছর সময় লেগেছিল। মানুষের এ-রকম সময় লাগে বা লজ্জা হয়। দক্ষিণেশ্বর শিবমন্দিরের ভিতরে গিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে বিগ্রহের সামনে নত হবার সময়ই সহসা তার বিশাল পাছার উত্থান আমি দেখি, তার জঙ্ঘা ও কুন্তল ও স্তন ও নিতম্ব ও গ্রীবা মুহূর্তে একাকার হয়ে যায়, তার জঙ্ঘাকুন্তল-স্তননিতম্বগ্রীবা ও আমার ধর্মাধর্মবোধের বিপুল ধাক্কা ও উপর্যুপরি ফাটার শব্দে আমার শরীরময় সমস্ত জীবন বিধ্বস্ত হতে থাকে, তার জঙ্ঘা ও তার কুন্তল ও আমার ধর্ম ও আমার অধর্ম ও তার স্তন ও তার নিতম্ব ও আমার যৌনবোধ ও তার গ্রীবা—আমার এতদিনের এইসব আমার চোখের সামনে একাকার হয়ে যেতে দেখে নতজানু হয়ে ভেঙে পড়ে তার বিস্তীর্ণ শ্রোণি আমি দু'হাতে জড়িয়ে ধরি, উজ্জ্বল প্রদীপের চচ্চড় শব্দের মধ্যে আ মা দে র প্রগাঢ় যৌনচুম্বন তাকে টেনে তোলে, ঠোঁট ছিঁড়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আমার বুকে সেও উপর্যুপরি

চুম্বন করতে থাকে, তার জঙ্ঘা কুন্তল স্তন নিতম্ব ও গ্রীবা আমার বুকের ওপর সমূলে ভাঙতে থাকে। শাস্তির পরিমাণ দেখে আজ বুঝি একদিনে পাপ কত বেশি হয়েছিল, পুলিশে পিছু নিয়েছিল বলে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে চুম্বন করা কি ঠিক হয়েছিল?
ঠিক হয়নি, ঠিক হয়নি, ঠিক হয়নি। পাপ হয়েছিল।

...সুধার অঙ্গে হাত দিয়ে আজ চামেলির অঙ্গের কর্কশ চুলগুলি মনে পড়ে। সুধার একতাল মোটা কোমর আমি ভালো করে জড়িয়ে ধরি। দর্শকের মত সে চেয়ে চেয়ে ছাখে। আমার চোখের ভিতর দিয়ে চেয়ে থাকে।
বাইরে বৃষ্টির শব্দ ক্রমশ আর শোনা যায় না। তার কষ্ট হচ্ছিল। যৌনকষ্ট তার পাবার কথা না, তার অভ্যাস আছে। অপমানিতও সে হতে পারে না। তবে?
সে এক-একবার বলছিল, "উঃ, কী হাড় আপনার গায়ে। ফুটছে, মাংসর ভেতর বিঁধে যাচ্ছে।" "কী গরম, জ্বর হয় নাকি আপনার?" অবশেষে বলেছিল, "খাওয়া হয়নি কিছু—দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—তারপর আপনি এলেন—উঃ—খাওয়া হল না—উঃ—আমার খাওয়া হয়নি—উঃ—" এইসব সে বলছিল। অনেকদিন পরে জানতে পারি সে তখন গর্ভবতী ছিল।

একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে মাঝে একদিন ওপাড়া ঘুরে এলুম। সকলের সঙ্গে দেখা করে এলুম—কার্টসি কল। দেখলুম সকলেই বেঁচে আছে বহালতবিয়তে। অসুখবিসুখ করেনি কারুরই এ দু'বছরে বা করলেও বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। সকলেই চিনতে পারল

এমন কি শান্তাও। প্রথমটা চিনতে পারেনি।

শান্তাকে আমরা প্রথম ধরি কলিন লেনের এক অবৈধ ব্রথেল-এ, সে যে ফোকলা তা কে জানত। তার সামনের দুটো দাঁত ছিল বাঁধানো, আমরা বুঝতে পারিনি। ভেনিশিয়ান রেড কোট ও আমার হাওয়াই চপ্পল পায়ে সে গিয়েছিল পেচ্ছাপ করতে। বাথরুমে তার বমি পায়। কমোডের ভেতর দাঁত-দুটো পড়ে গেল। ভাস্করের হাত ধরে তার সে কী কান্না। সেদিন রাতটা তার বাড়িতেই কাটানো গেল। প্রচেত বাড়ি চলে গিয়েছিল, পরদিন বেলা করে সে এল। শান্তা সারা সকাল ঠোঁট ফাঁক করে কথা বলেনি, ঘণ্টাকতক খুব ঝামেলায় ফেলেছিল যাহোক। অন্যসময় ওর গাম্ভীর্য ভান মনে হত, সেদিনই ওর ভানহীন গাম্ভীর্য আমি প্রথম দেখি। আজ সোনা-বাঁধানো হাসি হেসে সে বলল, "ও! বুঝতে পেরেছি। তারপর—কী খবোর—আসো না কেন আর?" বীণারও অবস্থা ফিরে গেছে, তার বিছানায় কাশ্মীরী সুজনি, ঘরে উজ্জ্বল আলো। সে উপহার পেতে ভালবাসত, তাকে একখণ্ড শারদীয় উল্টোরথ উপহার দিয়েছিলুম। সে কথা মনে করিয়ে দিতে মুহূর্তে তার সবই মনে পড়ল। সে উল্টোরথ খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিল।

নীলিমা গুপ্তাকে হার্লট বলব কিনা জানি না, কারণ জানি না অন্যান্য যে-সব ভদ্রমহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাদের তাহলে কী বলব। নীলিমা গুপ্তার দরকার হয়েছিল টাকার। ১,০০-টাকার দরকার হয়েছিল নীলিমা গুপ্তার। হাঃ হাঃ, বলেছিলুম, দোব। যাহোক আজ বার্-এ বেরুবে বলে তৈরি হচ্ছিল, গা ধুচ্ছিল বাথরুমে। একজন হেঁকে বলল, "ও নীলিমা, তোর ঘরে একজন বাবু এয়েচে রে।" বাথরুমের ভেতর থেকে অবিশ্বাসিনী বলে উঠল, "যাঃ!" বুঝলুম ওর বাজার পড়ে গেছে, আজকাল কেউ আসে না, বার্ থেকে মাতাল হয়ে-পড়া যাদের কেবল আশ্রয়ের লোভ দেখিয়ে ও আনে, তারা

ছাড়া। তাদের কাছে স্ত্রীলোক কিছু না, মধ্যরাত্রির সজ্ঞান মাতালেরা একটা ঘরে গিয়ে ঘুমুতে চায়। তবুও পরদিন বাড়ির সবাই জানবে নীলিমার ঘরে লোক এসেছিল, দালালে শেয়ার চাইবে, মাংসঅলা গুনে নেবে পয়সা। নীলিমা মদ আনাতো দুপুরে। একা বসে খেত। ভালবাসত একা খেতে।

শান্তা সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধিয়ে ফেলেছে, বীণার অবস্থা ফিরে গেছে। ৩৷৹ টাকার বেডকাভার নীলিমা কাচাতে পারেনি হপ্তা-দুই, ছেঁড়া, অনেক দাগ এখানে সেখানে।

আলমারি থেকে বাসি-করা একটা কাপড় বের করে আমার দিকে পেছন ফিরে সে পরল। দেখলুম, তার বয়স হয়েছে। দেখলুম, তার আলমারিটা ফাঁকা, এ-রকম ফাঁকা আলমাবি আমি আগে কখনো দেখিনি কোনো বেশ্যার, যদিও তাডাতাড়িই সে পাল্লা বন্ধ করে দিয়েছিল।

ভালবাসাবাসি

মীরা লিখেছে, "তুমি আমার জীবনে আগে এলে না কেন!"

এলুম এটা ধরেই নিয়েছে। ভালো। আমি তার ভুল ভাঙাব না। আমি তার চিঠি পেয়ে হোহো করে হেসে উঠেছিলুম। এই হাসি ভয়াবহ একথা মনে করিয়েও হাসি থামাতে পারিনি। থামাতে পারেনি বলে সুনীল রায় এখন লুম্বিনীতে।—"আগে এলে না কেন?" হাহা. আমার ফের হাসি পাচ্ছে, কে, কাকে, কী-প্রশ্ন করছে!!

পুরীতে ঝড়বৃষ্টি

বজ্র ও বিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি সুরু হয়েছে। সমুদ্রের এমন অদ্ভুত চেহারা মনে হয় স্বপ্নে দেখেছিলুম। শত্রুপক্ষের আলোয় সমস্ত দিগন্ত কেঁপে ওঠে। মাঝে মাঝে সমুদ্র তার ত্রিশূল তুলে ধরে। দণ্ডায়মান [perpendicular] বিদ্যুৎ আমি আগে দেখিনি। মাঝে মাঝে হাওয়া পড়ে যায়, শব্দ থেমে থাকে কয়েক মুহূর্ত, তারপর অদূরে প্রথম ব্রেকারের কাছে ঢেউ ফেটে পড়ে—সমুদ্রের কামানের শব্দ হয়। ওরা জলে পেট্রোল ছড়িয়ে দিয়েছে, একমাত্র আঁধারে রূপালি আগুনের স্রোত বারংবার ছড়িয়ে পড়ে।

যুদ্ধের শব্দ—এইসব। আগুন জলে ওঠার শব্দ, কামান দাগার শব্দ, শিঙাভেরিকাড়ানাকাড়া বেজে ওঠার শব্দ ;

আমাদের কোনারক থেকে করতালের শব্দ ভেসে আসে।

আত্মবিজ্ঞপ্তি

এখানে-সেখানে যে বলি "ঈশ্বরে বিশ্বাস করি", এটা কি ঠিক বলি ? ক্ষমাহীন থাপ্পড় একদিন কি খাব না গালে যে, "এই লোকটার আস্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে ছিল, এ লোকটা ড্যামড্ লায়ার, আহাম্মক আমার সম্পর্কেও মিথ্যে কথা বলে গেছে ?"
নাস্তিকে তার ক্ষমা পাবে, চামেলি পাবে। আমিও ঈশ্বর হলে তাকে ক্ষমা করতুম। মানুষ বলে পারি না। সে বলে সে আমাকে বোঝে না, স্পষ্ট তার কথা, বাস্তবিক সত্য এ-রকমই, তার ঐ স্পষ্টতা। "আমি

বুঝি না”—একথা বলায় দোষ নেই। কিন্তু আমি বলি, “আমি বুঝি”, বুঝি-না এ-কথা আমি বলতে পারিনি। আমি নির্বোধ এ-কথা জেনে বিনীত না হয়ে পড়ে আমি কপট হয়েছি।

যোনিহীন নারী হলে বড ভাল হত। শুধুই আদর করার জিনিশ হলে। কিন্তু এ যে আবো মারাত্মক !

এ-ও ভাবি, জীবনে নারীসংক্রান্ত সমস্ত দাবী ছেড়ে দেব কী করে ?

মা। এত বাড ভালো নয়, ছ্যাখো না কী হয়

আমি। কী আবাব হবে, তোমার মুখ,দিয়ে রক্ত উঠবে, আমি তার ওপর···

মা। [চেঁচিয়ে] ওঃ

আমি। [চাপা স্বরে] নিচু গলায় কথা বলো

মা। [ফল্‌স দাঁত চেপে] ভগবান, যেন কুঠ হয়···যেন প্রাণে না মরে

একটা গ্লাস তুলে নিয়ে মার মুখের দিকে জল ছুঁড়ে দিই। গ্লাসে জল ছিল না। মা মুখ সরিয়ে নেয়।

তবুও মুল অসুবিধে মনে হয় আমার এই হাত ছু’টি নিয়ে। কী ফাংশান এদের ; হাত দু’টি নিয়ে কী করব কিছুই বুঝতে পারি না ; শরীরময় সমস্ত জীবনের মধ্যে হাত দু’টিই শুধু স্ট্রেঞ্জ লাগে।

শরীরের কথা মনে পড়ে, যেন কত দূরের কথা। কোথায়

আছো তুমি শরীর, ভাল নেই জানি, শান্ত হয়ে আছো এত. কতটা পচেছ ?

স্মৃতিচিত্র

দমদম রোড দিয়ে একটা মস্ত সিনেমার ব্যানার নিয়ে যাচ্ছে দু'জন কুলি ; ব্যানারের ওপর, দুর্গের পাঁচিলে অসিযুদ্ধ, পাহাড, ঝর্ণা ছুটন্ত ঘোড়সওয়ার ও সমবেত নাচের ওপর, মেঘ ও চাঁদের ওপর ঝরঝর করে ঝরে পডছে কলকাতার আঞ্চলিক বৃষ্টি—বসন্তপঞ্চমীর দিনে হলুদ-ছোপানো শাড়ি পরে একটি ফুটফুটে কিশোরী ও খুবসম্ভব তার ভাই, তারা ব্যানারের নিচে ঢুকে পড়েছে অনুমতিবিনা— কুলিদের সঙ্গে মার্চ করে হেঁটে যাচ্ছে…তাদের মাথার ওপর এ-প্রান্ত থেকে আলুলায়িতা নায়িকা অবিরল বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ও-প্রান্তের নায়কের দিকে হাসতে হাসতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে ছুটে যাচ্ছে।

পরিচারিকার নাম আশা

সারা দিনে নানাজিনিশ চাই, নানাজিনিশ দরকার হয়। রাগ, অভিমান, খিদে ইত্যাদি হয়, কখনো-বা বেশ লাগে। অসহায় বোধ করি···চেয়ে দেখি কোনো defence নেই। বিপদের মধ্যে পড়ে যাব মনে হয়—গেলে কিছুই করা যাবে না—কোনো ব্যবস্থা নেই। বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি মনে হয়। মুণ্ডু ঘুরিয়ে বারবার করে দেখি কেউ আসছে কিনা, মুক্তিটেলিগ্রাম বা কোন সাহায্য।

'কুকুরের মত।'···দুঃখ ও অপমানবোধে চুপ করে থাকি।

নইলে নানাকথা বলি, নানাজিনিশ প্রয়োজন হয়। "একগ্লাস জল নিয়ে আয়", বলি। "এতদিন রইলি, অথচ, তোকে যদি বলি দাড়িকামানোর জিনিশগুলো নিয়ে আয়, পারবি না, হয়ত টিউব বা কাঁচি আনতে ভুলে যাবি, কিম্বা ফেনা রাখার জন্যে দেশলাইয়ের খালি বাক্স।"

"যদি ধুয়ে ঠিক মত তুলে রাখতে পারতিস কতো ভালো হতো ;" —বলি।

কাঁধের কাছটা টিপে দিতে বা শুতে যেতে বলি।

"তোর দ্বারা আমার কাজ হবে না। তোকে ছাড়িয়ে দেবো।

এতদিন হয়ে গেল এখনো তোকে সব বলে দিতে হয়।” রেগে বলি, “বল্লে তবে করিস, নইলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকিস।”

সারাদিনে নানাজিনিশ চাই। এটা-ওটা দরকার হয়। প্রতিটি চাওয়ার মধ্যে আশা থাকে, যে পাব। যেমন, “একগ্লাস জল দে রে আশা”, বা, “রাত হয়েছে, আশা শুতে যা।”

কাল দেখা হবে

মানুষ নুয়ে পড়ে। "কী রে, কেমন আছিস?" এর উত্তরে অনেক-কাল পরে কাল দেখা হলে অংশু ভেবেছিল বেচুকে বলবে যে, "এখন একটু নুয়ে পড়েছি, বুঝলি?" বুঝবে কি বেচু? কথাটার সত্য কিছু পাবে কি? বেচুও কি কাটায় নি তারই মত ৩৫-বছর, তবে কেন বুঝবে না, বেচু কেন কথার-কথা হিশেবে নেবে, নেবে না মনে হয়। অবশ্য সে এটা খুবই স্পৃহাহীন গলায় বলবে। ইচ্ছে করে যে স্পৃহাহীন, তা না। ৩৫-বছরে তার কণ্ঠস্বর যে-রকম তা-ছাড়া অন্য কোনো-ভাবে কথা বলার তার উপায় নেই, এই জন্যে। সে কেনই-বা বলতে যাবে খামোকা, তার দায়িত্বটা কীসের, সে তো কোনো নাটকের চরিত্রে অভিনয় করছে না। সে বলে গেলেই হবে, নাটক হবে কিনা বলা যায় না, কিন্তু চরিত্র না হয়ে যাবে কোথা, হতে বাধ্য, কেননা, অংশুর চরিত্রে সে ছাড়া আর কে রূপদান করবে?

"একটু নুয়ে পড়েছি," এই কথাই সে বলবে। তখুনি না। পরে বলবে,"বুঝলি?" বেচু বুঝবে না? যদি না বোঝে, তাতেও অংশুর কথা মিথ্যে হয়ে যাবে কি? যাবে না। বুঝলে বড় বেশ হত, বেচু বুঝলে। কিন্তু অংশুর সত্য তবুও কিছু আছে যা কিনা, বেচুনিরপেক্ষ। "আমি একটু নুয়ে পড়েছি," এই হচ্ছে অংশু বা নিরপেক্ষসত্য বা তার চরিত্র। (এখানে অংশুর চরিত্রের শারীরিক নুয়ে-পড়ার কথা বলা হচ্ছে।)

এরপর, অংশু আরো বলবে। বেচু আরো-জানতে চায় ভালো—না চাইলেও সে বলবে। তার কাজ পুরোটা বলা. এইজন্যে সে আর-একটু বলবে। (ঈষৎ হেসে বলবে জানা কথা।)

"কিন্তু মজা কী জানিস?" অংশু বলবে (হেসে), "শুধু এইটুকু বলে যদি আর-কিছু না-বলার থাকত! এখনো, বুঝলি বেচু, ঐ যে নুয়ে-পড়ার কথা বললুম না, ওটা সোজা হতে চাইছে। মানে, আগের মত হতে চাইছে। অথচ ছাখ, নুয়ে তো পড়েছি—এ্যাঁ? আর··· একবার নুয়ে-পড়লে ঐ নুয়েই তো থেকে যেতে হয়, কিছুতেই আর সোজা হওয়া যায় নাকি, কেউ কি হতে পেরেছে সোজা, এ্যাঁ, তুই বল না? এই হয়েছে মুস্কিল, বুঝলি ভাই! আবারো সোজা হওয়া যায় না—জানি; হয়ত আরো নুয়ে-পড়া ঠেকাতে পারি, হয়ত পারি না। এটা জানি না বটে। চেষ্টা তো করছি খুব যাতে অন্তত আর নুয়ে না পড়তে হয়। কারণ একবার নুয়ে পড়লে কী হয় বুঝতে পেরেছি। ঐ যে বললুম তোকে? একবার একটু নুয়ে পড়লে, যতটা নুয়ে পড়লে ততটা নুয়েই থেকে যেতে হয়, সোজা হওয়া আর যায় নাক', এই আর কী। এটা জেনেছি। বেশ তো তা না হয় হল যে জেনেছি যে, জানি। কিন্তু জানি যখন তখন অবস্থাটা মেনে নেবো না কেন? নেবো তো? ঐ···যেটুকু একবার নুয়ে পড়েছি—সেইটুকু মেনে নেবো তো। যে, যা হবার হয়ে গিয়েছে, তার তো আর চারা নেই, আর যেন নুইতে না হয় এ-রকম, এ-রকম একটা attitude নেবো তো? কিন্তু মজা কী জানিস, যা প্রথমেই বলেছিলুম তোকে···ঐ ঐ-টুকু নুয়ে-পড়া সোজা হতে চায়, আবার, ঠিক অবিকল-আগের মতন সোজা। সম্ভব না। জানি; জেনেছি। তবু ঐ tension থেকে যায়। কষ্ট এই···আর কী···উম্‌ম্‌ম্‌ম্‌, আর কিছু নাঃ।"

এত বলে, বেচুর মুখের দিকে না তাকিয়ে, বোধহয় চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে অংশু বলবে, "আমি এইরকম আছি বেচু।"

চাইবাসা, চাইবাসা

চাইবাসা, ২৩।১।৬০

প্রিয় সন্দীপন নিশ্চিত ভালো আছিস। সুনীলকে একটা চিঠি দিয়েছি। তুই ও সুনীল উভয়ে কেমন আছিস জানাস। ইতিমধ্যে কাশী গিয়েছিলি কি? আমার ওপর বিরক্ত হবাব সত্যিই কিছু নাই। শীলার বিষয় সম্পূর্ণ আমার এক নতুন খেয়াল। ও নিয়ে আমার ব্যস্ততা যত পরিদৃশ্যমান, অন্তর্গত ঘনশূন্য বুঝতে পারা তোর উচিত ছিলো। মোটের উপর ব্যাপারটার মধ্যে লক্ষ্যনীয়তা যা তোরা দেখে গিয়েছিস তা অভিসন্ধিমূলক। অভিসন্ধি যদি আমায় ভবিষ্যতে বাঁধে, বাঁধতে পারে, তাতে ক্ষতি কার? প্রেম আমার নাই, আমাদের কারুরই নাই, সুনীলের আছে। এত কথা তোকে বলতেই আমাব লজ্জা করছে। ভেবে দ্যাখ, চাইবাসায় তোর ব্যবহার আমার প্রতি তত প্রীতিজনক ছিলো না। তোর প্রীতি না পেলে কষ্ট হয়, হযতো ভবিষ্যতেও হবে। তুই যদি নিজেকে না বোঝাতে পারিস তবে আমায় চিঠি দিস না। তোর নির্ভরতা বা বন্ধুতা আমার ভীষণ মূল্যবান জিনিশ—আংশিকভাবে কোলকাতার একমাত্র। নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলে আমি যেমনভাবে চলাফেরা করতাম, তেমনিভাবে আর চলবো না, সামান্য বদলাতে হবে—একটু জানাস। গত কয়েকদিন ধরে সারা কোলকাতা শূন্য মনে হচ্ছে। চাইবাসাও পূর্ণ নয়। যেতে

ইচ্ছে করছে না বলে রয়ে যাচ্ছি কেবল, দিনের পর দিন। আমি বেশ দুর্বল।

তুই চিঠি দিস নি বলে ধরেই নিচ্ছি তোর জানাবার বা সংবাদ নেবার কোনো লোভ নাই। সমীর ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখে কোলকাতা যাবে, ওর সঙ্গে যাবো, যাওয়া-থাকা সমান। পরীক্ষার জন্যে একবার যাওয়া দরকার ছিলো। কিন্তু কিছুই ভাবতে ভালো লাগছে না। তোকে বিরক্ত করবার জন্যে বলছি না, অবস্থা আমার ন্যক্কারজনক। ভালোই আছি।

শক্তি

চাইবাসা, ২৬।৮।৬০

প্রিয় সন্দীপন, যাবার ঠিক আগে তোকে চিঠি লিখছি, হয়ত আমি পৌঁছানোর পরে তুই চিঠি পাবি। ইতিমধ্যে একটি পোস্টকার্ড পেয়েছিলাম, সুনীলকে দিয়েছি। কৃত্তিবাসের কী সংবাদ? তুই লেখার দিকে সামান্যতম এগিয়েছিস কি।

আমার গত রবিবার যাবার কথা ছিলো, কিন্তু নানাকারণেই যেতে পারলাম না। এই সোমবার নিশ্চয়ই পৌঁছাব। এখানে এসে বড়ো কাব্যনাটক একটা শেষ করেছি; না ঠিক শেষ হয়নি, আজই করবো। মাঝে রাউরকেলা গিয়েছিলাম। আজ সমীর রাঁচি গেলো কাজে, আমার যেতে মোটেই ভালো লাগলো না। আমি অনেক পদ্য লিখেছি। আমার পদ্য তোর আজকাল ভালো লাগে না। আমার জীবনযাত্রাও তোর আজকাল ভালো লাগে না। হয়তো আমিই ভুল। কিন্তু সবকিছু দেখতে দে। তোর জন্যে প্রতিদিনই কষ্ট হয়। শীলার জন্যেও। পৃথিবীর সবার জন্যেই কষ্ট অথবা লক্ষ্য আমার তারও

কম। অনুভব করতে পাবলে ভালো, না পাবলেও কোনো ক্ষতি নাই। কোলকাতায় গিয়ে স্থির করবো অদ্ভুত বিস্ময়কর প্রস্তাব একটি, আমি যে-কোনো উপায়ে এ-বছরেই বিলাত যেতে চাই। এ-দিকের কোনো অসুবিধে হবে না, তুই তোর ভাইকে লিখে দে। গিয়ে বিস্তাবিত বলবো। তুই অবাক হয়ে যাবি।

কৃত্তিবাস-সম্পর্কে এখানে ভাবতে ভালো লাগছে না। গিয়ে দেখবো। তুই কেমন আছিস? দীপেন কেমন। আর সবাই?

তোর শক্তি

সেণ্ডার্স নেম অ্যাড্রেসেব ঘব ফাঁকা, আপনার চিঠি দেখে প্রথমটা আমি চমকে উঠেছিলুম, সন্দীপনবাবু। আপনার ইংরেজি হাতের লেখাব সঙ্গে আমি ততটা পবিচিত নই, এবং খুলে পডবার আগেই ডাকছাপ দেখে শখের গোয়েন্দাগিরি না করেই বুঝতে পেরেছিলুম আপনার চিঠি। খুলে দেখলুম যতটা কঠিন চিঠি আমি আশা কবেছিলুম তার চেয়ে অনেক কঠিন, নিষ্ঠুর চিঠি আপনি লিখেছেন।

আপনাকে যে-যে বিষয়ে আহত করেছি সেগুলি চিঠিতে কেন উল্লেখ করতে গেলেন। আমি কি জানিনা? যে-সময় ঐ ব্যবহারগুলো করেছিলুম তখন থেকে জানতুম। আপনাকে ঐগুলি কতটা আঘাত করেছে তা বুঝতে পেরেছিলুম কাশী যাবার আগের দিন বিকেলে কফি হাউসে যখন আপনি আমার উপস্থিতিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা এবং অপমানজনক ভাবে অবহেলা করছিলেন। অথচ ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছিলুম বলেই আমি একটুও অপমানিত বোধ করিনি। আপনি আরও দু-একদিন কলকাতায় থাকলে আপনাকে আরও কিছু আঘাত করে আপনার কাছ থেকে আমার প্রতি আরও কিছু অপমান-ব্যবহার আদায় করে নিতুম।

আপনার চিঠিতে দেবেশের নাম দেখে আমি সব বুঝতে পারলুম এবং বিরক্ত বোধ করলুম। আসলে তার আগের দিন বাজারের চায়ের দোকানে আমি যে চিৎকার করে করে আপনার নিন্দে করছিলুম, সেখানে দেবেশ-দীপেন উপস্থিত ছিল বলেই আপনার গায়ে আঘাত লেগেছে। দেবেশকে অত মূল্য দিচ্ছেন কেন? না হলে আমার গলার লঘু স্থর আপনার কানে নিশ্চয়ই ধরা পড়ত। এ কথা কি এতদিনে বুঝতে পারলেন না যে বন্ধু হিসেবে যাকে যেটুকু শ্রদ্ধা করবার করি—এ ছাড়া যে ঠিক বন্ধু নয়—মানুষ হিসেবে তাকে আমি কখনই গ্রাহ্য কমি না। দেবেশের দু'টি গল্প আমার খুবই ভাল লেগেছে—কিন্তু দেবেশ রায় নামে যে ছেলেটি সেদিন বসেছিল আমার কাছে তার মূল্য অমুক-তমুকের চেয়ে বেশি নয়। দেবেশের উপস্থিতিকে বেশি মূল্য দিয়েছেন বলেই আপনি রজ্জুস্পর্শে সর্পবিষ যন্ত্রণা বোধ করেছেন। আমার মনে হয় দেবেশের গল্পের যখন আমি প্রশংসা করি তখনও আপনি, গল্পলেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, আহত বোধ করেন।

বোধ করাই উচিত। অন্তত আমি তো এ-দিক দিয়ে ভীষণ স্বার্থপর—আপনি যখন অন্য কারুর, সমবয়সীর, কোন প্রশংসা করেন—তখন আমার অসহ্য বোধ হয়, আমার ক্রোধ আমার শরীরের সমস্ত রন্ধ্রে নীলরঙে জ্বলে ওঠে। কিন্তু তার কোন একস্‌প্রেশন কখনও প্রকাশ পায়নি। তার কারণ, আমি ভেবেছি, আমি যা পছন্দ করব, যা আমার মনোমুগ্ধকর, আমার বন্ধুরা শুধু সে-রকম ব্যবহারই করে যাবে এ ভাবা নিতান্ত পাগলামি।

ফেরার ট্রেনের রাত সম্বন্ধে আমার সত্যিই কিছু বলবার আছে—সেদিন যা বলেছি সবই উল্টো—নিজেকে ঢেকে আপনাকে আঘাত করার চেষ্টা। কিন্তু সত্যিকারের ভাবনাটা বললেই হয়তো আপনি যথার্থ আঘাত পাবেন আজ, এমনকি সারা জীবনে আর বাক্যালাপ পর্যন্ত করবেন না। এ-ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাকে বলতেই হবে।

আপনার সঙ্গে আমার কতকগুলো বেসিক আইডিয়ায় তফাৎ আছে —এ-জন্যই আপনার সঙ্গে কথা বলবাব, দেখা করবার জন্য এত আন্তরিক টান বোধ কবি। মেয়েদের সম্বন্ধে আগনার এবং আমার ধাবণার পার্থক্যটা ঠিক বুঝতে পারলুম এবার চাইবাসায়। অবশ্য এটা আপনার সত্যিকারের ধারণা কিনা জানি না, অন্তত আমার মনে হল। আগে আমি আমার বন্ধুদের বলতুম যে মেয়েদের দিনের সাড়ে-তেইশ ঘণ্টাই পছন্দ কবি না। আগে কথাটা না ভেবে বলতুম—এবাব বুঝতে পারলুম, দিনেব অনেকক্ষণ কোন রমনী-ভোগের চিন্তায় কাটানোর মত প্যাশান আমাব নেই। তা ছাডা একটি মেয়েকে ভোগ করার চেয়ে—তাব কাছে পুরুষের শিভাল্‌রির পরিচয় দেওয়াটা বড বলে আমার মনে হয়। অর্থাৎ একটি মেয়েকে যদি টাকা দিয়ে ভাডা করেন আপনি, তবে আপনি হয়তো যথার্থ প্রেমিক পুরুষের মতই তার কাছ থেকে যেটুকু নেবাব নেবেন। আর আমি টাকা দিলেও তার কাছে হাঁটু মুডে বসে তাব কৃপা ভিক্ষা করব (মাতাল না হয়ে, ঠাণ্ডা মাথাতেই।) অর্থাৎ কোন মেয়ে হয়তো আপনার কাছে শুধু রক্তমাংস, অথবা সৌন্দর্যেব আধাব অথবা অনুভবের প্রতিমূর্তি—আমার কাছে এর কোনটাই তেমন আকর্ষণায নয়—সমস্ত মিলিযে তাব উওম্যানহুড। কথাটা পরিষ্কাব করতে গেলে অনেক বলতে হবে—বরং ফেবাব ট্রেনের রাত্রিব কথা বলি। সেরকম অভিজ্ঞতা আমাব আগে কখনোই হয়নি।

ট্রেনে, আপনার পদতলে, আদিবাসী যুবতীটিকে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছিলুম—ভেবেছিলুম আপনাব রাত্রিটা আনন্দে কাটবে, বাসে ছোট মেয়েগুলিব কাছ থেকে আমি যে তৃপ্তি পেয়েছি—আপনিও সে-রকম কিছু পাবেন। বাঙ্কে উঠে দু'বার উঁকি দিয়ে দেখলুম—আপনি অত্যন্ত গোপনে মেয়েটির শরীর স্পর্শ করবার চেষ্টা করছেন। এরকমই হয়, এর বেশি আর কী হবে—আমার মজা লাগতে লাগল। আপনি ঠিক হয়ে বসতে পারছেন না, ছটফট করছেন, আপনার যাবার পথের

ঘুম ফেরার পথে কোথায় মিলিয়ে গেছে। আমি ঘুমোবার জন্য বাঙ্কে চিৎ হয়ে শুয়ে আমার পিতাকে পরলোকগত মনে করে বাড়ির কথা ভাবতে লাগলুম। চোখের উপর আলোটা পড়েছিল, হাত দিয়ে চোখ আড়াল করতে চেষ্টা করলুম। আমার আঙুলগুলো লাল দেখাতে লাগল, খুব কাছ থেকে আলো পড়লে আঙুলগুলো লাল দেখায়। হঠাৎ আমার মনে হল আমার হাতের আঙুলে আমার বাবার রক্ত লেগে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলুম। মনে-হওয়াটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিলুম না। বুঝতে পারলুম, আধুনিক গল্প-উপন্যাসে এরকম বিষয় থাকে বলেই সুযোগ পেয়ে আমার মন একবার এরকম ভেবে নিল। নচেৎ, কেন আমি, কেন···এই সময় আমি দেখতে পেলুম আপনার পদতল থেকে মেয়েটি সোজা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার একপাশে আপনি, অন্যদিকে একটি কালো রঙের পুরুষ, সামনে একটি কুৎসিত বৃদ্ধা, পিছনে দেয়াল। এর মধ্যে থেকে সে সোজা উঠে দাঁড়াল, কোথাও গেল না, শুধু শরীরের গ্রন্থিগুলি একটু সহজ করে নিতে চাইল। তখন তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ভীষণভাবে চমকে উঠেছি। মনে হল, কি অদ্ভুত, অসহ্যরকমের কাতর তার চোখ—সে সমস্ত রাত্রির কাছে একটু ঘুম প্রার্থনা করছে। একটু নিরুদ্বেগ, শান্ত ঘুম।

তৎক্ষণাৎ মেয়েটির প্রতি আমরা সর্বপ্রকার যৌন বাসনা অবসিত হল। শিভাল্‌রি দেখা দিল। মনে হল, মেয়েটিকে একটু ঘুম কি এখন কোন প্রকারেই উপহার দেওয়া যায় না। মনে হল, সন্দীপনের কি উচিত নয় লঘু হাত দুটি শান্ত করা, মেয়েটিকে তার বুকে মাথা রেখে ঘুমুতে দেওয়া উচিত। সেটা সম্ভবও ছিল। খানিক পরে মাঝে মাঝে মেয়েটি ঈষৎ ক্রুদ্ধ-অবাক হয়ে আপনার দিকে তাকাচ্ছিল, ওর মা কি বলবার চেষ্টা করল। আমার অস্বস্তি লাগছিল। মেয়েটি যখন দ্বিতীয়বার উঠে দাঁড়াল, তখন তার চোখ আরো কাতর, অসহায়।

তখনই প্রচণ্ড ক্রোধে আমি জ্বলে উঠলুম, যে রকম ক্রোধ আমার কদাচিৎ আসে, তিনচার দিনের আগে কমে না। আমার মনে হ'ল (ক্ষমা করবেন সন্দীপন আমার রূঢ়তা, এগুলো আমার তখনই শুধু মনে হয়েছিল, এখন মিলিয়ে গেছে, আপনাকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, পুরোনো চাইবাসায় কোনো লোক অথবা আমাদের বাড়ির কামিন মেয়েটির প্রণয়ী যদি আপনাকে মারবার জন্য টাঙ্গি তুলতো— আমি আমার কাঁধ দিয়ে তা প্রতিরোধ করতুম, তবু ট্রেনের কামরায় আমার মনে হয়েছিল, আমার শরীরে তখন যেন আসুরিক শক্তি) আমি সন্দীপনকে দুই হাতে তুলে নিয়ে গিয়ে বাথরুমে খানিকটা জল ঢেলে দিই মাথায়, মেয়েটিকে ওর স্থানটুকু উপহার দিই। তার চেয়েও ভয়ংকর, আমার মনে হয়েছিল, যদি মেয়েটি চিৎকার করে, যদি কম্পার্টমেণ্টের সমস্ত লোক সন্দীপনকে অপমান করতে আসে, তবে কি. আমি আমার বন্ধুকে সাহায্য করতে এগোবো? হয়তো না।

এই যে 'না' ভেবেছিলুম—এর ফলে আমার কষ্ট হয়েছিল। তার তুলনায় আপনাকে কীইবা আহত করেছি। তিনদিন পরে আমি স্বাভাবিক হলুম, আবার লেখক-হিসেবে আপনার ভালোমন্দ বুঝতে পারলুম। শনিবার আপনার কথা ভীষণভাবেই অনুভব করলুম— ফলে তাশ খেললুম না, শনিবারে পড়াতে গেলুম না। আপনি তখন বড-দীপেনের সঙ্গে গল্প করছিলেন। কারণ আমি জানি। সোমবার দেখা হল, আপনি সেই প্রথম, আপনার সঙ্গে আলাপ হবার পর এই প্রথম, আমাকে একটু-একটু অপমান জ্ঞানত করবার চেষ্টা করলেন। অথচ আমার খারাপ লাগল না, অপমানিত হলুম না। ভালোই ত লাগল। কারণ তখন কিছু প্রতি-ব্যবহার পাওয়া আমার প্রয়োজন ছিল। চাইবাসায় কাছাকাছি থেকে আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা যদি একটু নিচু হয় কর্কশ হয়, আমি খুশি হবো খুব। কারণ আমার সম্বন্ধে আপনার অতিশয়োক্তি শুনে শুনে আমি ক্লান্ত। আপনার

সম্বন্ধে আমার ধারণা কোনো ব্যবহার কিংবা আপনার কোনো কথাবার্তায় বদলাবার সম্ভাবনা নেই। এ-বিষয়ে তাহলে আবার অনেক বলতে হয়। ছেঁড়া কাগজের উপমা দিয়ে যা বলেছেন ওটা একেবারেই ছেলেমানুষকে বোঝাবার মত।

শক্তি কোলকাতায় ফেরেনি। আমি চাইবাসায় একটি চিঠি দিয়েছি—কোন উত্তর নেই। আপনি কেমন আছেন। জনসেবকের চাকরি আমি এখনও নিইনি, ভাবছি। কলকাতায় শীত আত্মহত্যা করেছে—এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বসন্তকে তার উত্তরাধিকার দিয়ে গেছে। ভালবাসা নেবেন।

সুনীল

১৩।১।৬০

শক্তির পোস্টকার্ড দুটো চাইবাসা থেকে লেখা। ডাকঘরের ছাপ ২৩।১।৬০ ও ২৬।৮।৬০, যথাক্রমে ১৮ সারদা চ্যাটার্জি লেন হাওড়া ও ৯।২ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন কলকাতা এই ঠিকানায় আমি চিঠিদুটো পাই। সুনীলের চিঠির তারিখ ১৩।১।৬০, লেখে ২২ শ্যামপুকুর স্ট্রিট থেকে, পাই ২৪।১৬ পাঁড়ে হৌলিতে। কাশীর পাঁড়ে হৌলি। এবার বাড়ি-পাল্টানোর সময় এগুলো পেয়ে গেলুম।

শক্তি ও আমি ডিসেম্বর '৫৯-এর গোড়ায় দিকে চাইবাসায় প্রথম যাই। কোনো-এক সমীর রায়চৌধুরির সঙ্গে আগের দিন শক্তির আলাপ হয় কৃত্তিবাস পত্রিকার তৎকালীন সান্ধ্য অফিস দেশবন্ধু পার্কে, যে চাইবাসায় ইন্সপেক্টর অব ফিসারিজ ও সুনীলের বন্ধু। পরদিন বিকেলে, কফি-হাউসে, তাকে হাওড়া স্টেশনে সী-অফ করতে যাবার প্রস্তাব শক্তি সহসা আমাদের দেয়, আমাকে ও সুনীল পাল নামে একটি ছেলেকে, যার সঙ্গে ১৫-মিনিট আগে আলাপ করিয়ে দেবার সময় শক্তি

আমাকে বলে যে সে কয়েক বছর আগে ম্যাটি কুলেশনে ফার্স্ট হয়েছিল ও তখন অধ্যাপক। সেদিন নভেম্বর ১৯৫৯-এর মাইনের পুরোটাই তার পকেটে ছিল। আমরা তিনজনে স্টেশনে গিয়েছিলুম। সম্বলপুর প্যাসেঞ্জারে সমীরকে পাওয়া গেল না। ক্রমে সবুজ আলো জ্বলে উঠলে শক্তি তার দ্বিতীয় প্রস্তাব আমাদের দেয়। আমরা সেটিও মেনে নিই।

পরদিন ভোরে রাজাখার্সোয়াং পৌঁছে খুব শীত পায় আমাদের, কারো গায়েই সোয়েটার ছিল না। রাজাখার্সোয়াং-এর মিস্টি রোদে দাঁড়িয়ে গরম জিলিপি খেতে খেতে (জিভে লেগে আছে...) এবার রাজাখার্সোয়াং-টু-চাইবাসার দু'টি টিকিট আমরা কিনি, ।৵০ আনা করে বেশ পৌঁছে যাই চাইবাসা। আমি ২০ দিন ছিলুম। শক্তি থেকে যায় ৯ মাস, ডাকঘরের ছাপ-অনুযায়ী অন্তত ২৬।৮।৬০ পর্যন্ত।

ফিরে-আসার কয়েকদিনের মধ্যে কিছুটা বিশ্বস্তসূত্রেই এই উড়ো-খবর আমি পাই যে শক্তি চাইবাসার সেনট্রাল জেলে রয়েছে। তছরুপের কথাই আমি শুনি। এটা শুনে, তখন আমরা ছেলেমানুষ ছিলুম বলে, আমার ও সুনীলের খুব মনোকষ্ট হয়। আমি ও সুনীল, শক্তির দুই বন্ধু, আমরা সেদিন রাত্রেই আবার সম্বলপুর প্যাসেঞ্জার ধরি। এটা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। আমি নিই হাওড়ার চেনা দোকান থেকে ৩-টে খালি সোডার বোতল, চাইবাসায় এক্সচেঞ্জ করার কথা ভেবে, এটা সুনীলও যুক্তিযুক্ত মনে করেছিল। সুনীল একটি ক্যাপস্টানের টিন নিয়েছিল, যা গরাদের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে ডোরাকাটা শক্তির হাতে ওর দেবার ইচ্ছে ছিল। টিনটা আমরা ট্রেনে খুলিনি। মাইরি।

চাইবাসায় গিয়ে এবারেও সমীরকে পেলুম না, ট্যুরে। কিন্তু শক্তি? পরদিন জেলে গিয়ে খবর নিলেই হবে এ-রকম ভেবে, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে টিনটা ও ওপরে ৩-টে শূন্য সোডার বোতল রেখে, ডাকবাঙলো ছেড়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম নদীর দিকে, চাইবাসার শ্মশানের দিকে শীতের রাত্তিরে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলুম গান

গাইতে গাইতে। মধুটোলার কাছে ফটাস করে একটা বাড়ির দরজা খুলে গেল, "এত রাত্তিরে চাইবাসায় রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় কে রে," বলতে বলতে শক্তি বেরিয়ে এল।...এখানে হঠাৎই মনে পড়ল, এই মধুটোলার রাস্তাতেই, "সাইকেল কি' সাঁতার কেউ কখনো ভোলে ভাই", বলে তড়াক করে সাইকেলে লাফিয়ে উঠে ঐ বাড়ির ৫-বোন ও ৩-বন্ধুর সামনে সুনীল উল্টে দাড়াম করে রাস্তায় পড়ে যায়। যাই হোক, সেদিন রাত্রে, নভেলে পড়া যায় এমন মধ্যবিত্ত প্রবাসী বাঙালির লালটালির বাড়ির মধ্যে বসে আমরা দু'জনে আধ-ঘণ্টার মধ্যে বুঝতে পারি যে শক্তি জেলে নেই। ক্যাপস্টানের টিন খুলতে আমরা ডাকবাঙলোয় ফিরে যাই।

ঐ বাড়ির দু'টি মেয়ে সমীরের ও শক্তির বান্ধবী (একজন পরে সমীরের স্ত্রী) এটা বুঝতে আমাদের পুরো দু'দিন সময় লেগে যায়। এটা বুঝে মধুটোলায় ওরা সান্ধ্য চা-পান করতে গেলে, আমি ও সুনীল শোডার বোতলগুলো (তখন ভর্তি) একের পর এক জ্বলন্ত হ্যারিকেন লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারি। সমীরের লেপ, তোশক ও মশারিতে আগুন লেগে যায়। আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে রোরো নদীর ওপারে গিয়ে আমাদের জীবনের প্রথম আদিবাসী রমণীর কাছে থেকে জীবনের প্রথম মহুয়া খাই। তার শারীরিক সৌন্দর্য ছিল।

চাইবাসা থেকে ফিরেই আমি মায়ের কাছে কাশীতে চলে গেলুম। সম্ভবত একই ট্রেনে, ডুন এক্সপ্রেশে, সুনীলের চিঠিটাও আমার সঙ্গে যায়, কারণ হিশেবমত ১৪।১।৬০ তারিখে আমি সেবার কাশী পৌঁছেছিলুম। যাইহোক ঐ চাইবাসা পরে আমাদের তিনজনের লেখাতেই বেশ একটা ভূমিকা নিয়েছিল বলতে হবে। আমি সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী নামে গল্পটা লিখি, সুনীল যুবক-যুবতীরা ও অন্যান্য। শক্তির লেখার এক-অংশে চাইবাসা হাহাকারের মত ছড়িয়ে রয়েছে।

চাইবাসা থেকে অদূরে পাহাড়ের ওপর হেসাডির ডাকবাঙলোয়

বড প্যাঁচে পডেই কবি তথা লেখক হিশেবে আমাদের ডি. এফ. ও. শ্রীকমলাকান্ত উপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। প্রমাণ-স্বরূপ শক্তি ওঁর সামনে একটি ছোট-কবিতা রচনা করে, যার মধ্যে 'ছুটে কে তুলিলে শালবন বাহুবন্ধন চারিধারে', এ-রকম একটা লাইন ছিল। বস্তুত ছোট ও বড দলে চাইবাসায় আমাদের একাধিকবার যেতে হয়েছিল। শক্তি বারংবার গেছে। চাইবাসায় যাওয়ার জের আমাদের পরবর্তী জীবনেও বেশ কয়েকবছর ধরে চলে, ওখানে না গেলে আমরা হয়ত এ-রকম হতুম না। কী হতুম? রাজা হতুম, আবার কী। কিম্বা ঘোড়া ওডাতুম? 'ঘোড়া ওডাতুম' কথার কথা। এতটা প্যাঁচে পড়তুম না।

কয়েকটি শিরোনাম। ২

বেশ্যা

বেশ্যার ঘরে আয়না থাকবেই, দেওয়াল-জোড়া আয়না, ছোটবড়, নানা সাইজের দামী বা সস্তা আয়না, এক-একটা কারুকার্য-করা। খাদ্যদ্রব্য কদাচিৎ দেখেছি, তবে বাসন থাকে। কাঁচের, কলাই-এর, কাঁসা ও পিতলের বাসন। বেশ্যা-সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ক'টি তথ্য এই হতে পারে যে—১, সে উপহার পেতে ভালবাসে। ২, তার soul আছে। ৩, তার লজ্জাহীনতা সত্যের মতো। ৪, সে মৌলিক নির্বোধ। ৫, সামনে কোনো সময় নেই এমন মানুষ যদি ভাবা যায়, সে তাই।

তার সম্পর্কে একটি কথাই গভীরতরভাবে ভেবে দেখার। তার শরীর যখন একজন ভোগ করে, কী মানসিক অবস্থায় সে থাকে। 'লোক' এলে সে সুখী হয়, বিরক্ত হয়, তাকে ঘৃণাও করে। লোককে হিংসা সে কখনো করে না। যখন লোক তাকে উলঙ্গ করে, সে বিরক্ত হয়, একবার উলঙ্গ হলে স্বস্তিবোধ করে, তার সহজ লাগে। কিন্তু বেশির-ভাগ লোক একসঙ্গে উলঙ্গ হয় না, আলো নেভাবার আগে অন্তত আণ্ডারউয়্যার বা গেঞ্জি পরে থাকে। বেশ্যার নগ্নতা সে ছাখে, তাকে দেখতে দেয় না। তারপর কতকগুলি নিয়মকানুন তারা মানে, বেশ্যারা, যে-সময় শয়তান তাদের সাহায্য করেন বা

ঈশ্বর, যেজন্য তারা কদাচিৎ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

পাপ

পুলিশে পিছু নিয়েছিল বলে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে চুম্বন করা ঠিক হয়নি, ঠিক হয়নি, ঠিক হয়নি। পাপ হয়েছিল।

ভালবাসা

ভালবাসা জেগে উঠলে নির্বুদ্ধিতা স্তূপাকার হতে থাকে। আজ সেই পবিত্রাত্মা নির্বোধ আর নেই, আজ সিংহাসন জুড়ে বসে আছে ভারি ও বৃহৎ মস্তিষ্ক, হৃদয়ের সাধ্য নেই তাকে টেনে নামায। আজ কে কার আসনে বসে আছে।

ভয়

'তুমি কি তোমার জাহাজ তৈরি করেছ, ওগো তুমি কি তোমার জাহাজ · ওগো তুমি তোমার জাহাজ তৈরি করো, কেননা তোমার জাহাজের দরকার হবে।'

বন্ধুবান্ধব

বিক্রমের জাহাজ ডুবে গেছে। দড়িদড়া ছিঁড়ে গেছে। বেচু হাঁটছে টর্চ ফেলে। প্রচেত আমার কুকুর, আমি প্রচেতের। ছিল ডুন

এক্সপ্রেশের পুরোপুরি টিকিট, কুনাল নেমে গেল ডগমগপুরে. যা শালা। ভাস্কর সবকিছু কব্জা করে ফেলছে, হোঃ হোঃ, জলিফলি ছাড়া চৌধুরিবাবুর আর কিছু-ভালো লাগে না।

অন্ধকারে বেচুকে দেখা যায় না। সে টর্চ ফেলে হাঁটছে। কেতকী ও ভবতোষ কেবল এরা দু'জনেই একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। বিক্রম ভয়াবহভাবে জলে লাফিয়ে পড়ে, এখন একটা বয়া আঁকড়ে ধরে ভাসছে। একই জায়গায় দুলছে তার বয়া, ভেসে যাচ্ছে না। কড়া রোদে মানব একটা লাস ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেবল কেতকী ও ভবতোষ···ভালবাসা পেলে আশা সমূলে নষ্ট হয়ে যায়। জলের ভিতর ওদের জড়াজড়ি শিকড় স্পষ্ট দেখা যায়। ভেসে যাচ্ছে কেবল কেতকী ও ভবতোষ! কোথায় যায় তারা? ভাসতে ভাসতে তারা যায় চৌরিঙ্গিতে, ডানলপ ব্রিজে, তিলজলায়, শ্যামবাজারে, চেতলায়; যায় ব্যাণ্ডেলে। নর্দমার থেকে শূন্য ওভার-ব্রীজে উঠে, নর্দমায় নেমে যায়।

ভাস্কর, বিক্রম, চৌধুরিবাবু ও বেচু এরা চারজনে চুরোট পেল কোথা থেকে! এরা চারজনেই ধরিয়েছে চুরোট। কেতকী ও ভবতোষের মুণ্ডু ভাসতে ভাসতে চৌরিঙ্গি দিয়ে চলে যায়। যায় চেতলায়, উল্টোডাঙায়, বেহালায়, ব্যাণ্ডেলে। বরাহনগরে চলে যায়। তাদের স্বচ্ছ ও উন্মূল জড়াজড়ি বিক্রম, চৌধুরিবাবু, বেচু ও ভাস্কর···ও চুরোটহারা আমার নাকের ডগা দিয়ে দুলতে দুলতে চলে যায়।

শাস্তি

প্রায় ১২-বছর পরে ও ৩-বছর আগে হাওড়া স্টেশনে স্কুলের

বন্ধু মন্মথর সঙ্গে দেখা। প্রথমে ১২-বছর পরের কথাটা বলি। “হ্যাঁরে, তোব মনে পড়ে,” সে হাসতে-হাসতে আমাকে জিজ্ঞেস করল, “আমাদেব মর্নিং-স্কুল যাবার পথে একটা দেবদারু গাছ ছিল ?’ এমন অপ্রত্যাশিত ছিল তার প্রশ্ন যে আমার মর্ম পর্যন্ত চমকে উঠেছিল যেন সে আমার আইডেনটিটি চ্যালেঞ্জ করছে। আমি বুঝতে পেরেছিলুম সে তার সত্য স্মৃতি থেকে কথা বলছে এবং এর যথার্থ উত্তর আমাকে দিতে হবে। মনে পড়ে...মনে পড়ে...মনে পড়ে... মনে পড়ে···পাশবিক নখে আঁচড়ে আমি আমার সমস্ত মন তছনছ করে ফেলি। মর্নিং-স্কুলের কথায় আমার একবার মনে হয় কুয়াশা, মনে হল ক্ষণেকের জন্যে কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটা মরুপথ ও পথের ধারে এক একাকী বৃক্ষের অবয়ব একবাব দেখতে পেলুম, তারপর আবার কুয়াশা। মন্মথ দুঃখ করে বলে গেল, “ভুলে গেছিস ?”

আজ ৩-বছর পরে মন্মথর সেই স্বর আবার আমাকে হানা দিচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভিযুক্ত করছে, “ভুলে গেছিস ?”

আমার সংশয় ছিল, মিথ্যা উত্তর আমি তাকে দিতে পারিনি। বস্তুত, যে দেবদারু গাছ আমার মনে পড়েছিল, তা আমি কল্পনা করে নিয়েছিলুম। স্কুল-যাবার পথ, ভোর, কুয়াশা—এর কোনোটাই আমার প্রকৃত স্মৃতি থেকে আসেনি।

মন্মথর সঙ্গে দেখা হবে না, হয়ত কোনোদিনই দেখা হবে না আর। উত্তরের জন্যে সে ৩-বছর সেখানে অপেক্ষা করতে পাবেনি, তার ট্রেনের সময় উত্তীর্ণ হয়েছিল। সে হন-হন করে চলে যায়। কিন্তু আজ, ৩-বছর পরে, তাকে আমি অকপটে বলতে পারি, “কী শাস্তি তুমি আমাকে দেবে দাও মন্মথ, হ্যাঁ, আমি দোষী। আমার কিছু মনে নেই, আমি সব ভুলে গেছি।”

কে রবীন্দ্রনাথ

সোহো স্কোয়ারে এক প্রস্টিটিউট আমার বন্ধু ভাস্করকে জিজ্ঞেস করেছিল, "সো ইউ কাম ফ্রম দা ল্যাণ্ড অব টেগোঅর?" ভাস্কর বাও করে বলেছিল, "বেগ ইঅর পার্ডন?"

"সো ইউ…" সে আবার পুরোটা বলে। "টেগোঅর?" মাথা নিচু করে কপালে গুনে দশটা টোকা মেরে তারপর ঝট্ করে মাথা তুলে ভাস্কর জিজ্ঞেস করেছিল, "ওয়েল? হূ ইজ হী?" বজ্জাতি করেছিল। গত বছর একজন প্রগতিশীল বা সাম্যবাদী কবির সঙ্গে দক্ষিণমুখী টু-বি বাসের আপার-ডেকে একদিন দেখা। উনি বললেন, "সাজ্জাদ জাহির আসছেন অমুক দিন, রণজির ইনডোরে। আসছ তো?" কে সাজ্জাদ জাহির? আমি জিজ্ঞেস করিনি। হয়ত ভাবতেন বজ্জাতি করছি। সাজ্জাদ জাহির কিন্তু একজন নামকরা লোক. পরে জানতে চাওয়ামাত্র জানতে পারলুম, উনি একজন সাম্যবাদী বা প্রগতিশীল লেখক। মস্কোয় ভারতীয় লেখকদলের নেতৃত্ব করেছিলেন। যেমন, পি. লাল আর কী। পি. লাল কে আবার জিজ্ঞেস করবেন না যেন।

ভাস্কর ইয়ার্কি করেছিল। ইয়ার্কিরই সম্পর্ক! কেননা কোন্ শালা বলতে পারে কে উত্তমকুমার? ফিল্মিণ্ডিয়া কাগজে নার্গিসের পদ্মশ্রী-অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হয়েছিল। ইনট্রোডিউস করে দেবার সময় আণ্ডার-সেক্রেটারি শুধু নাম করেই চুপ করে গিয়েছিলেন। নেহেরু তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকান। অর্থাৎ, কে? আরো বলো! ভদ্রলোক তখন বাকিটা বলেন। তারপর নার্গিস বললেন, "পণ্ডিতজী আমাকে চিনতে পারলেন না, কিন্তু আপনার বাবা, লেট মতিলাল নেহেরু আমার মা জদ্দনবাঈকে ভালোই চিনতেন।"

তেমনি রবীন্দ্রনাথ। সবাই জানে কে।

কিন্তু কর্ণপুর কী? বা কে? কেউ জানে না। অথচ এক প্রফেসর-দম্পতি দেখেছিলুম। স্বামী আমাকে একটা থান ইঁট দিলেন, উপহার, 'কবি কর্ণপুর ও তৎকালীন বাঙলা কাব্য', যা লিখে উনি ডক্টরেট পেয়েছেন। বইটাতে খালি ফুলস্টপ দেখলুম—কমা, সেমিকোলন, লীডার (··), ড্যাশ এ-সব নেই বললেই চলে, সম্ভবত তার বদলে রয়েছে তথ্যাশ্রয়ী, তত্ত্বাশ্রয়ী, চৈতন্য, সত্তা, নিরঞ্জন সূর্য, অভিব্যঞ্জনা, উচ্চকোটি—এইসব। খবরের কাগজে যেমন থাকে সমষ্টিউন্নয়ন, ত্রিপাক্ষিক কমিটি, জাতীয় সংকট বা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা। এঁর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছিলুম। ইনি "রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম"-কে কবিতা বলে মনে করেন না ("পিওর প্রোজ।"), রবীন্দ্রনাথের ছবি তাঁর অন্ধকার দিককে তুলে ধরে বলে মনে করেন, পঁচিশে বৈশাখ জোড়াসাকোঁয় যান। ভোরে ভৈরবী ও সন্ধের ঝোঁকে পূরবী শোনেন।

'সো মোহ কান্তা, দূর দিগন্তা' সম্পর্কে ইনি লিখেছেন দেখলুম 'অবিনাশী কবিত্ব।' আমার বন্ধু সুনীল খুব স্মার্ট লেখে। 'গোটা চর্যাপদে গোয়েন্দা লাগিয়েও কবিতা খুঁজে পাই নি,' সে লিখেছিল।

ডক্টর এটা পড়েন নি মনে হয়, এইসব। পড়লেও ইগনোর করেছিলেন। কেননা, তাহলে তো, যদি চর্যাপদ তথা কর্ণপুরে কোনো কবিতা না থেকে থাকে, তা হলে কিছু অপরিচিত লোক এসে একদিন, "কর্ণপুর যখন কবিই নয় তখন আর এ-সব কেন," বলে তাঁর ফ্রাজ, টেলিফোন, বাথরুম, বেডরুম, উড়ন্ত-পর্দা এ-সবই খুলে নিয়ে যেতে পারে। ট্যাঙ্ক থেকে পেঁপের ডাঁটা দিয়ে চুষে নিতে পারে পেট্রল। 'নারীকেও নিয়ে যায়'···সুনীলের কবিতায় পড়েছিলুম। ও হো।

কিম্বা কে জানে হয়ত সংবিধানগত কারণে তা পারে না। তবে

একটা কথা ঠিকই, 'কর্ণপুর কোনো কবি নয়, আসলে কানপুর.' এটা স্বীকার করা ওঁর পক্ষে বড় ব্যয়সাধ্য। কারণ, তাহলে,

অন্তত এই বোধ নিশ্চিত তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে। প্রফেরসকে।

তুলনামূলকভাবে যাঁরা রবীন্দ্রকাব্যপরিক্রমা করে চলেছেন তাঁরা খানিক নিশ্চিন্ত।

কাউণ্টার পয়েণ্ট

মানুষে করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই, মানুষ মানে অবশ্য মানুষের মাথা; মাথা, মাথা, মানুষের অপরিত্যাজ্য শত্রু। মানুষের মাথাই সৃষ্টি করেছিল ঈশ্বর, অমরতা, জীবনের মানে প্রেম—

কে না কেঁপে উঠেছে সন্দেহে

হ্বের্থাবের দুঃখ বা ক্ষুদিরামের মাতৃভক্তি—সে যাই হোক। কিন্তু মানুষের মাথা একটি মাত্র জিনিশ সৃষ্টি করেনি, তা হল মৃত্যু। তবুও, 'সমস্ত ব্যক্তিগত কনসাসনেশ-এর শেষ মৃত্যু', 'সন্দেহহীন ধ্রুবসত্য' বা 'একমাত্র রিয়্যাল' এই-ই, এ-রকম মনে করে নিতে গেলেই শরীরের সুদূর অন্তঃপুরে, রৌদ্রে, দপ করে ভেসে ওঠে একরাশ মাছি, তৎক্ষণাৎ গুঞ্জন শোনা যায়, অচিরে বুক ও মাথার চারিপাশে তারা উড়ে আসে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত রক্ত মাংস ও হাড়ের যে শরীর, নিছক শরীরময় যে সমগ্র জীবন, তার মূলে মূলে একটা নড়াচড়া টের পাওয়া যায়— তাই কী? তাই তো? ঠিক তো? 'যে চতুর্ভুজের বাহুগুলি পরস্পর সমান কিন্তু একটি কোণও সমকোণ নহে তাহাকে বিষমকোণী সমচতুর্ভুজ বা রম্বস বলে' বললে সমস্ত বুঝে ক্লাস সিক্স-এর ছাত্রও প্রশ্ন করে, 'তাহলে তাই তো?' 'এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে,' বলে, হত্যার একমাত্র সাক্ষীকে আদালতে দাঁড়িয়ে পরমুহূর্তেই বলতে হয়, 'জানিনা সে

এইখানে শুয়ে আছে কিনা।' এতে করে আদালতের অবমাননা করা হয়।

ঐ জিজ্ঞাসাচিহ্ন, ঐ মনস্ট্রসিটির হাত থেকে জীবন পরিত্রাণ চায় কারণ মনে পড়েই যে জীবন একটা। ও পরবর্তী জীবন বলে কিছু নেই! সিদ্ধান্ত নেওয়া এইজন্যেই প্রয়োজন—যেটা হবে স্টার্টিং পয়েন্ট। স্ত্রীলোক-সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যে-কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়ে—যেমন আমরা বিবাহ করব না রক্ষিতা রাখব, সোনাগাছি যাব না হর্টিকালচার-উদ্যানে যেতে ডাকব প্রেমিকাকে, আমরা কি আগে প্রেম করে পরে সঙ্গম করব, না প্রথমে সঙ্গম করে পরে প্রেম··· এ-সকল চিন্তাতেই উত্তেজিত হয়েছিল আমাদের পুরুষার্থ, এ-ভাবেই নষ্ট হয়েছে আমাদের চায়ের সময়, কারণ ঐ, পূর্বে বলা হয়েছে, জীবন একটা এবং এটাই কি একমাত্র রিয়্যাল নয় যে মৃত্যুতেই জীবনের শেষ? শরীরের সুদূর থেকে আবার কাছে চলে আসে উড়ন্ত চাকি, খোলা জানালা দিয়ে এই অক্ষরগুলির উপর এসে পড়ে একপশলা বৃষ্টি, উঠে জানালা বন্ধ করে দিতে হয়, উডন্ত চাকি বুকের চারিপাশে ও মাথার চারিপাশে ঘুরতে থাকে—ঠিক তো? তাই কী? কোনোই সন্দেহ নেই, কোনো সম্ভাবনা নেই? ছায়ার প্রতিচ্ছায়ার মতও নেই কোনো সম্ভাবনা? 'তাহলে তাই তো?'

কে না কেঁপে উঠেছে সন্দেহে? কাকে না, কখনো না কখনো, ধরাশায়ী করেছিল সন্দেহ? যারা এ দেশের সাধারণ মানুষ, কবি, কেরাণী, প্রফেসর, ব্যবসায়ী, খেলোয়াড়, পলিটিশিয়ান বা এ্যালোপাথিক ডাক্তার—তাদের সমস্যা ছিল অন্য, তারা সবচেয়ে বেশি সন্দেহ করেছিল তাদের আন্তরিকতাকে, তারা ছিল হাফ-উইটেড, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে উভয়ত। এরা সব এদেশের সাধারণ লোক। কোথাও এদের শান্তি ছিল না, না মস্তিষ্কে না হৃদয়ে। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অবিরাম যুদ্ধ—এটাই প্রকৃত

ঐ অস্থিগুলি ছাড়া কিছু আর পড়ে নেই

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, যাতে মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়পক্ষই পরাজিত হয়। এটা বুঝতে ২০-শতাব্দীর মধ্যসময় পর্যন্ত সময় লেগেছিল। আজ আর কোনো সন্দেহ নেই, অভিমান নেই, রাগ নেই। আজ পরাজিত হবার মত কিছু নেই। 'সর্বস্বতার কিছু আজ পড়ে নেই শৃঙ্খল ছাড়া।'

হায় ও হোঃ হোঃ হোঃ, আমাদের কেউ পুনর্বিবেচনা করে দেখতে বলেনি। কে বলবে ? বলা বাহুল্য, "তুমি তোমার বাবার ছেলে ও তোমার ছেলের বাবা, বাছা, তুমি তোমার সন্তানের জন্যে কিছু করে যাও," এসব আমাদের বলা বৃথা, আমাদের কেউ বলে না। দেশরক্ষা, ভিয়েৎনামের মুক্তি, স্ত্রী, জওয়ান, প্রেমিকা, কারো জন্যে স্যাক্রিফাইস করতে আমাদের কেউ বলেনা, এতবড় মিটিং হয়ে গেল বুদ্ধিজীবীদের, আমাদের ডাকেনি তো কেউ। আমাদের পোজিশান এই যে আমরা কখনো ভুল করিনি, আমাদের, অতএব, কখনো ভুল ভেঙে যায়নি। কোনোরূপ স্যাক্রিফাইস আ ম রা করিনি। রবীন্দ্রনাথ আমরা আদৌ পড়ে উঠতে পারিনি, বুঝি একবার রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিশ্বাস হয়েছিল, ভুল তখুনি ভেঙে গেল। আজ আধুনিক গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের কাছে ৫২ ও ৫৩, বলা বাহুল্য যে আমরাও মনে করি যে যাঁহা-৫২ তাঁহা-৫৩, যাঁহা সত্যজিৎ রায় তাঁহা ত্রুফো। আমরা রূপকে কখনো রূপান্তরিত করে দেখিনি। রূপ আমরা মানি, রূপান্তর মানি না। যেমন, আবার, আমরা মৃত্যু মানি। আত্মা, অমরতা, ঈশ্বর, পরবর্তী জীবন, এগুলো রূপান্তর, এগুলো মানিনা। এইজন্যেই আমাদের গল্পের সব চরিত্র শেষকালে মরে যায় বা মাঝখানেও আমরা অনেক সময় তাদের ছেড়ে দিই যে, "এই পর্যন্ত লিখলুম তারপর তারা যে-যার অসুখে মরে গেল।"

আমবা স্বাধীনতাব চেযে বেশি
চাই, আমরা চাই স্বেচ্ছাচাব

কত অসুখ আছে, টি.বি., ডায়াবিটিস, আর্থারাইটিস, হেপাটাইটিস, সিফিলিশ, গনোরিয়া, নানারকম ম্যানেনজাইটিস, নানারকম আলসার,

রিউমাটিজম অফ দা হার্ট, কতও রকমের অসুখ আছে এবং এগুলোর একটাও সম্পূর্ণ সারে না। একজন ডাক্তার আমাকে একবার বলেছিল, "আরে মশায়, জুতোয় একবার তাপ্পি লাগালে তা কি আর নতুন জুতো হয়?" নতুন জুতো কিনে প্রত্যেকটা ডাক্তারকে জুতোতে ইচ্ছে করে।

যাই হোক, যে-কোনো দু'টি ইনকিওরেবেল অসুখ বিবেচনা করে দেখা যাক। এনকেফেলাইটিস; একরকমের ভাইরাস, ব্রেন আক্রমণ করে, চারদিন ১০৬° বা তার বেশি। সারভাইবাল শূন্য। আফ্রিকায় একরকম পোকার কামড় থেকে হয়। কিন্তু আমেরিকায় কেন হয়? কেউ জানে না। ক্যানসার অফ দা কিডনি; প্রথমে রক্তপ্রস্রাব হয়। মৃত্যুর আগে গলা দিয়ে বেরোয় রক্তের ডেলা ও প্রস্রাব। প্রত্যেকটি রুগী মৃত্যুর আগে জেনে যায় যে সে তার নিজের প্রস্রাব বমি করতে করতে মরে যাচ্ছে। সারভাইবাল শূন্য। রবীন্দ্রনাথের, মনে হয়, এনলার্জড প্রস্টেট হয়েছিল, ও কিছু না, অপারেশন করালে আজকাল সবাই সেরে যায়। শেষ পর্যন্ত হয়ত ইউরেমিয়া হয়েছিল তাঁর, আহা, কেউটের বিষ, বড় কষ্ট, রক্ত, মাংস ও হাড়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু এ-সম্পর্কে তাঁর কোনো প্রিমোনিশন ছিল না কেন? তাঁর চরিত্রদের কে কোন স্পেসিফিক অসুখে মারা গেল? "অসীম, আমার অসীম" বলতে বলতে শচীশ ছুটে চলে গেল নদীতীরে, যেখানে, জ্যোৎস্নায়, দামিনীর চোখের মত বালি ঝকঝক করছিল। তারপর তার কী হল? কী অসুখ করে সে মরল? তবে কি সে আদৌ মরল না নাকি? অবশ্য পৃথিবীতে ২৫ভাগ লোকের মৃত্যুর কারণ কেউ জানতে পারে না, তা জানে স্তব্ধতা, কিন্তু তারাও মরে যায়।

ওগো, তুমি কি তোমার ডাক্তার
খুঁজে পেয়েছিলে

অথচ এই ভয়, এনকেফেলাইটিস বা ক্যানসার অফ দা কিডনি সে যাই হোক, ভয় থেকেই অতি-আধুনিক কলকাতা জন্ম নিচ্ছে। ভয় একই

সঙ্গে ট্রানসেনডেণ্টাল ও অতিজটিল, ভয় সর্বত্র, কোনো সমাধান নেই, কোনো পরিত্রাণ নেই বলেই তা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা না করে মানুষ আজ এমন নিশ্চেষ্ট, তাই সে কিছু-করার পরিবর্তে, বাড়ি ফিরে রেডিও সিলোন খুলে দেয় ও রাত পৌনে-১১টা পর্যন্ত, "আব শিউকুমার সরোজকো আঁজ্ঞা দিজিয়ে, জয় হিন্দ" পর্যন্ত শোনে। বিপদ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান জন্মাবার পর, আজ আর আমরা কোনোরকম কাজ করিনা. বিশেষত এমন কাজগুলি আদপেই করিনা বা তার ধার-কাছ দিয়েও যাইনা যা নাকি আমাদের স্নায়ুর উপর বিন্দুমাত্র বা কোনওরূপ উৎপীডন করতে পারে। পেনে কালি ভরতে খারাপ লাগে, নিজে ভরি না, সপ্তাহে দাড়ি কামাই না তিনবাব. একসঙ্গে পর্যাপ্ত জামাকাপড করিয়ে নিয়ে সেগুলো ডাইংক্লিনিঙে দেয়া-নেয়া করতে থাকি এমন ভাবে যাতে নিজে ইস্ত্রি করে নেবার কোনোরূপ প্রয়োজন না দেখা

আরও ৩১ বছব বাঁচতে হবে দেয়। বস্তুত এইসব সুবিবেচনা বা স্নায়ুর

ভাবতে পারিনা প্রতি এ-রকম সৌম্য ব্যবহারের জন্যেই

অনেকের তুলনায় আজ আমরা এমন সুখী। ঘুম কেবল আমাদেরই আসে অবলীলায়। [এই কারণে আমাদের বন্ধুবান্ধব কখনো ভিটামিনের অভাবে মারা যায় না বা গাড়ি চাপা পড়ে না বা সুইসাইড করে না। বা সচরাচর পাগল হয়ে যায় না।]

বাকি থাকে স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক-ব্যাপারেও আমরা সবরকম করে দেখেছি। তাকে ভালোবেসে দেখেছি, উপেক্ষা করে দেখেছি, ঘৃণা করে দেখেছি সং আমাকে উপেক্ষা করেছে, রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে বলেছে, "রাস্‌কেল।" "আজ একটা কাণ্ড হয়েছে," হি-হি করে হাসতে হাসতে সে বলেছে, "তোমার গেঞ্জিতে আমার ব্লাউজের..." আরো হাসতে থাকে, "একসঙ্গে কেচেছিলাম" গেঞ্জি আলোর নিচে দু'হাতে তুলে ধরে, "দেখা যাচ্ছে, উঁ, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?" হালকা হলুদ দাগ, বাঁ-দিকে, গেঞ্জিতে, বুকের কাছে,

আলোর নিচে, "এই গেঞ্জিগুলোর কী-রকম দাম ?" সে তারপরেও

বাকিটুকু জানে নিস্তব্ধতা

বলে,"দাগ লাগিয়ে দিলাম তোমার গেঞ্জিতে", মাথা নিচু করে সে বলেছিল। এ-রকম কথাবার্তা স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমাদেরও হয়েছিল। বস্তুত, পাঠক, আপনি যেই হোন, পুলিশ-কমিশনার, মন্ত্রী, ক্রীড়া-সমালোচক, সৎকবি বা কেরানি, অধ্যাপিকা, নক্সালপন্থী বা ফিল্ম-ডিরেক্টার যেই হোন আপনি, কী আপনি পেয়েছেন যা আমরা পাইনি, কী আপনি করেছেন যা আমি করতে পারিনি ?

হৃদয়ের দিকে ৬॥০ ইঞ্চি

হৃদয়ের দিকে ৬॥০ ইঞ্চির বেশি কেউ এগোতে পারে না, কোনো মানুষ, সেখান থেকেই সে চিরকাল ছুঁড়ে যাচ্ছে তার গোলাবারুদ। আমরাও ঐ একই কাজ করেছি। কমিউনিস্টকংগ্রেসবঙ্গসংস্কৃতিকালচারালফ্রীডম-রাষ্ট্রভাষাএমারজেন্সিপুলিশসিসটেমপাকভারতচীনভারতআফ্রোএশিয়া-মেগাটনভিয়েতনাম কোনোকিছুর দিকেই এগোনো যায় না ৬॥০ ইঞ্চির বেশি, অতএব,আমরা পৃথিবীময় এই যৌনসভ্যতার বিরুদ্ধাচরণ অবশ্যই করছি, দেখা যাক আমাদের কী হয়।

বাকি থাকে স্ত্রীলোক কিংবা স্ত্রীলোকও বাকি থাকে না। একমাত্র জিনিশ যা স্ত্রীলোককেও ভুলিয়ে দিয়েছে তা হচ্ছে ভয়। সুপারস্টিশান জেগে উঠেছে, একটা দুর্ভাগ্য আশা করছি সবসময় যা সাক্ষাৎমাত্র আমাকে ভেঙে মুচড়ে ফেলবে, চিৎ করে পেড়ে ফেলবে মাটিতে। আমি জানি এ-সবই আমার ইনওয়ার্ড সিকনেস যা আমি বাইরে প্রোজেক্ট করছি। কিন্তু ভয়ে আমার শিকড় সরসর করছে। পা

Long live all cowards

থেকে মাথা পর্যন্ত রক্ত, মাংস ও হাড়ের এই শরীর, এই আমার সমস্ত জীবন এবং যতটুকু জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি এই আমার সমগ্র পৃথিবী। কোনোরকম টাইম-সেন্স নেই, কিছু আমি জানি, বাকি জানে নিস্তব্ধতা,

আগে বলেছি। যে যার পৃথিবী ছেড়ে, শরীরময় সমস্ত জীবন নিয়ে আমরাও গেছি উদ্ধারের শেষ আশা বিশ্ববিশ্রুত স্ত্রীলোকের কাছে, ঐ ভয়কে পেনিট্রেট করার জন্যে জানু ভেঙে বসেছি।

আমরা দেখেছি মহিলারা আমাদের জন্যে নয়। পৃথিবীর মহিলারা আলনায় ধুতি কুঁচিয়ে রাখে কেবল হাফ-উইটেডের জন্যে যারা অমর, কিন্তু আমরা যারা···যারা অমানুষিক ও সম্পূর্ণ গাড়োল, যারা মরণশীল ও কাওয়ার্ড—যারা ভীতু মানুষ—আমাদের পরিত্রাণ সেখানে নেই, কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারে না, আমরা বিবেচনা ও পুনঃপুনঃ বিবেচনা করে অবশেষে ঐ ভয়ের ভিতর ঢুকে যেতে চাই—পৃথিবীর ভীতু মানুষরা নিজেদের জয়ধ্বনি করতে করতে দু'হাত তুলে ভয়ের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, ঐ দেখুন।

নিদ্রিত রাজমোহন

ওই ঘুমুচ্ছে রাজমোহন। না, না। মরে যায় নি। কাল সকালেই আবার জেগে উঠবে। অবশ্য ঠিক কখন, ভোরের দিকে না বেলা-করে, তা আমি বলতে পারি না। জানিনা সে ছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে উঠবে, নাকি জেগে উঠে বহুসময় লেপ্টে থাকবে বিছানায়। এতে তার কোনো হাত নেই। এ-টুকুও আগে থেকে জানার উপায় নেই। রাজমোহন জানে না। তবে, একটা কথা. মানুষমাত্রেই ঘুমুতে ভালবাসে। রাজমোহন তাই ঘুমুচ্ছে। পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে তার মেয়ে ও বৌ। এই হচ্ছে প্রকৃষ্ট সময় রাজমোহনের-কথা বলার, সে এখন ঘুমুচ্ছে বলে। এবং, বিশেষত, সে আজকাল এ-ঘরে একা ঘুমুচ্ছে।

আজ বেশ তাড়াতাড়ি রাত ১০-টা নাগাদ মশারির ভেতর এ্যাশট্রে ও সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে সে ঢুকে পড়ে ও মাত্র প্রথমটি আধাআধি পৌঁছবার আগেই ঘুমে ছিঁড়ে যায় তার মাথা ; সেই থেকে ঘুমুচ্ছে। তার আগে অফিসফেরৎ সে গিয়েছিল রমার দাদার কাছে। উনি তখন সারিবদ্ধ আইনের আলমারির মাঝখানে অ্যাডজাস্টেবল টেবল-ল্যাম্পটা টেনে কাছাকাছি নামিয়ে খোলা ব্রীফের ওপর রেখে পেরী ম্যাশন পড়ছিলেন। তখনো মক্কেলদের আওয়ার্স সুরু হতে দেরি, কেউ কেউ বাইরে বসে ছিল। গরমকালে

খালি গায়েই মক্কেলদের সঙ্গে আলাপ করা ওঁর রেওয়াজ। স্নান করে আসার জন্যে সেই সোনালি-ফর্শা সম্ভ্রান্ত চামড়া আজো রাজমোহনের চোখে পড়ে। প্রথম-প্রথম এর মাহাত্ম্য সে বুঝত। চাঁচা ঝুলপির ওপর লাইব্রেরি-ফ্রেম চোখে পড়ত। আজ গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়ে গত ৭-বছরে দু'হাতের অধিকাংশ আঙুলে নানান ধাতুর আঙটি, আজ দু-একটি আঙুলে একাধিক করে, সে ছ্যাখে। রাজমোহনকে দেখে মুখ তুলে বরাবরের মত বিশ্বাসযোগ্য আন্তরিক গলায় উনি বলে উঠলেন, "আরে! এসো, এসো," চেয়ার দেখিয়ে দিলেন, "তারপর...খবর কী তোমাদের, এ্যাঁ? টুকিসোনার খবর কী? রমা· স্কুলে যাচ্ছে? চ্চঃ, চ্চঃ," আপশোস করলেন, "একটা ফোওন পর্যন্ত তোমরা করো না। আর আমিও—মানে এ্যাত্তো ব্রীফ নিয়ে ফেলেছি—" বলে হেসে পেরী ম্যাশন তুলে ব্রীফ দেখালেন। ওঁর এই ভরাট গলা, প্রতি শব্দে তার প্রয়োজনীয় ওঠা-নামা, একদিন ছিল যখন এ-সব লক্ষ্য করে রাজমোহন না ভেবে পারত না যে তার এ-রকম একটা গলা নেই। বাস্তবিক, দুপুরের ঘুম সন্ধে পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারলে তারপর নিজের গলা শুনে তারও একসময় কত-না ভাল লাগত। বাসে উঠে পয়সা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের ঘুম-জাগা গলায় শুধু 'টেরিটি বাজার' শব্দটা পর্যন্ত ছিল শোনার মত। দিব্বি কয়েকঘণ্টা থাকত ও-রকম, গলার আওয়াজ, অবশ্য ক্রমেই মিইয়ে আসত তার দার্ঢ্য—কৃত্রিম বই কিছু তো আর নয়। রমার দাদার গলা কিন্তু সারাদিন এ-রকম, রোজ, প্রায় প্রতি শব্দে। এ-সব আগে খুব লক্ষ্য করত রাজমোহন।

সত্যি বেশ কয়েকমাস খবরাখবর নেই, শেষ এসেছিল রমার দাদার বিবাহের রজতজয়ন্তীতে। ফ্ল্যাট থেকে রাস্তায় নেমেই, ২৫-গোলাপের তোড়া ও টুকিকে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে, "দাঁড়াও, একমিনিট" বলে, বিয়ের আগে তার কিনে-দেওয়া চান্দেরি পরে রমা এগিয়ে

গিয়েছিল ডাস্টবিন অব্দি ও তার মধ্যে আলতো করে ছুঁড়ে দিয়েছিল খবরের-কাগজ দিয়ে নীট্‌লি প্যাক-করা একটা প্যাকেট। বিয়ের প্রথমদিকে কিছুই বুঝতে পারত না, বাথরুমে একের পর এক জমে উঠত ছোট ছোট গম্ভীর প্যাকেট, তারপর হঠাৎ আর দেখতে পেত না। তখন রমা তার অবর্তমানেই কাজ সেরে রাখত। অথচ সন্ধের ঝোঁকে ফেলে দিতে প্যাকেট-হাতে রমাকে ডাস্টবিন পর্যন্ত যেতে দেখে প্রথমদিন একনজরেই সে বুঝেছিল কী: রাজমোহন বুদ্ধিমান। তাদের সাউথ কুলিয়া রোডের লোয়ার মিডলক্লাস পরিবারের সঙ্গে নেবু-বাগানের প্রসিদ্ধ ঘোষ পরিবারের সে তফাৎ করতে পেরেছিল। পেরে কিছু তৃপ্তি পেয়েছিল।

যাইহোক রমার দাদার সঙ্গে কিছু উত্তর-প্রত্যুত্তর শেষ করে আজ রাজমোহন তার অবিকল অফিসফেরৎ গলাতেই যার-পর-নেই বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রথমে বলল, "দেখুন মেজদা, আমি আজ শেষদিন বাড়ি ফিরছি এবং কাল থেকে ভবিষ্যতে কোনোদিন-আর বাড়ি ফিরব না।" বলে স্তব্ধ হয়ে গেল রাজমোহন। আমি ভাবলুম, ব্যাস, খেলা খতম, এই বুঝি বুকের ওপর ঝুলে পড়ল তার মুণ্ডু, আর বোধহয় মুখ খুলতে পারবে না। কিন্তু সাবাশ রাজমোহনকে, চেয়ার ছেড়ে ওঠার শুধু ভঙ্গিটুকু করা মাত্র, "কী বোওল—" পর্যন্ত বলতে দিয়ে তর্জনী তুলে তাকে বাধা দিতে দেখলুম, "না!" রাজমোহন উঁচু গলায় জানাল। "না, আজ কিছুই হয় নি," বলতে বলতে শক্ত হয়ে গেল তার পড়-পড় ঘাড়, নম্র হয়ে এল গলা, একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস প্রচণ্ড-জটিল দাড়ি ছুঁয়ে তার বোতাম-খোলা বুকে এসে লাগল। রাজমোহন বলল, "অন্তত, আজ, কিছুই হয় নি। ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি বা এ-ধরণের।···দেখুন মেজদা, আমি সব ভেবেছি। মেয়ে, রমা, ভবিষ্যৎ—আমাদের গুরুজন বা আত্মীয়স্বজনের কথা—দাঁড়ান, আমাকে বলতে দিন—এএএ, কী বলছিলুম, হ্যাঁ, বিশেষ করে আপনার কথা। কিন্তু

দেখুন,একটা সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার চেয়ে দু'জনেব আলাদা হয়ে যাওয়া ভাল। সর্বনাশ বলতে ধরুন খুন বা আত্মহত্যা ? আমরা প্রতিমুহূর্তে তিল তিল কবে নিজেদের খুন করছি এটা কেমন নাটুকে শোনায় যদিও আমরা তাই করছি। কিন্তু খুন বলতে আমি বলছি আর-একবার যদি আমি রমাব গলা টিপে ধবি, মানে ধরলে, এবাব হয়ত আমি ছাডতে পারব না। আগে দু-একবাব ধরেছি (হেসে) জানেন তো আপনি ? সেও তো কেলেঙ্কাবি, আমাদের বংশে কলঙ্ক, আপনাদের লোকাল প্রেসটিজ, লোকজানাজানি। বা আত্মহত্যা। শী শ্যাল অ্যাটেমপ্ট (মাথা নেডে) নো ডাউট। এক্ষেত্রে আমাদেব আলাদা হযে যাওয়া কী উচিত নয়, আলাদাভাবে হলেও অন্তত দু'জনে বাঁচব তো। প্লাঈজ, এটা বুঝুন। টুনিও বাঁচবে, রমাব অবলম্বন হতে পাববে। তার কাছে, আপনাবা যদ্দিন আছেন আপনাদের কাছে, মানুষ হতে পাববে। এ ছাডা," এই নিযে তৃতীয়বাব বাজমোহন ওঁকে চেয়াবে বসিয়ে রাখল ও কথা বলতে দিল না, "এ-ছাডা আমাব মুখের কথার দাম দিতে হবে না। আপনি একটা ডীড তৈরি করুন। আমি যদ্দিন চাকবি করব বা বেঁচে থাকব আমাব আয়ের অর্ধেক আমি, রমাব যদি নিতে প্রেসটিজে লাগে, মেযেকে দিয়ে যাব। বমাও চাকরি করে। আমি শিগগিরই এফিসিয়েন্সি বার ক্রশ করব। আমার আব কোনো উন্নতি না হলেও, এই পে-স্কেলে রমা আমার কাছ থেকে ২৪০ থেকে ৪৪০ পর্যন্ত মাসে মাসে পেয়ে যাবে।"

আমি ভেবেছিলুম রাজমোহন পাববে না। ধন্যবাদ রাজমোহনকে যে সে কোনো অ্যাডভাইস চায়নি। ভাগ্যিস রাজমোহন রমার দাদাকে সস্নেহ "আবার ঝগডা করেছ তোমরা," বা হতভম্ব "প্রবলেম কী তোমাদের" গোছের কোনো প্রশ্ন করতে দেয়নি। ধরা যাক, 'গ্রিনিং গোরিলা'র মলাটেব ওপর চশমা নামিয়ে বেখে যদি উনি জিজ্ঞেস করতেন, "তাহলে তোমরা বিয়ে করেছিলে কেন ?" ভাবা যায়! কী

উত্তর দিত রাজমোহন ? “এ কী বলছেন আপনি ? এ তো যে মরে যাচ্ছে তাকে 'তবে জন্মেছিলে কেন,' জিজ্ঞাসা করার মত, ভুল,” বলতে পারত কি সে ? না। তার সব গুলিয়ে যেত। আর, তার গুলিয়ে গেলে যা হয়, সে চুপ করে যেত। চিনি তো আমি রাজমোহনকে। কিন্তু, ধরো, উত্তরে যদি তাকে বলতে হত, গেল-বছরে আমরা একটাও চুমু খাইনি অথচ যৌনাঙ্গদুটি ব্যবহার করে গেছি, এই আমাদের প্রবলেম, তাহলে ? সন্দেহ নেই যে তাহলে রমার দাদা বিনা পারিশ্রমিকে তাও সলভ করে দিতেন। খাওনি কেন ? কেন যৌনাঙ্গদুটি শুধু ? কে দায়ী ? দু'জনেই সমানভাবে ? বেশ—কিন্তু কে সুরু করেছিল ? সামলাও ! রাজমোহন, আমি জানি, সামলাতে পারত না। ওদের ফ্ল্যাটের সিঁড়ির দরজার ছিটকিনি নিচের দিকে। রাজমোহন চটি থেকে বের করে পা দিয়ে তা খোলে। দেখেছি তো, কখনো নিচু হয় না। খামে ৬-মাস ধরে ঠিকানা লেখা, চিঠি লেখে না। এর মধ্যে রাইটিং-প্যাড নিয়ে তাকে কখনো বসতে দেখিনি কী ? তা নয়, গত শীতেই তুষের চাদর মুড়ি দিয়ে তাকে মধ্যরাতে আধঘণ্টাটাক বসে থাকতে দেখেছি যার মধ্যে দ্বিতীয় সিগারেটের আগুন থেকে সে ধরিয়ে নিয়েছিল তৃতীয়টি, ও, সন্তোষ খাতিরে, ডানহাতের রিস্টের ওপর, কলম নামিয়ে রেখে, মেরে-ছিল বাঁ-হাত দিয়ে একটা মশা। এ-ভাবেই স্নান করতে ঢুকে বাথরুমের টুলে বসে থাকতে তাকে কত দেখা গেছে। নগ্ন শরীর থেকে ঝুলে রয়েছে তার লম্বালম্বি হাত, হাতে ঝুলছে টিনের তোবড়ানো মগ, মাথা ভর্তি-চৌবাচ্চার পাড়ে নামানো। উপচে জল বয়ে গেছে কত। রাজমোহন এ-রকম। সে আজকাল হাত বুলোয়, বই পড়ে না। হাতের নাগালের একটু বাইরে সিগারেটের প্যাকেট, শুয়ে শুয়ে রাজমোহন মেয়ে বা ঝি-কে ডাকে, রমাকেও ডাকত। শীতকালে খাটের সামনে চটিজোড়া রেখে তবে সে বিছানায় ঢোকে, ভোরে তার প্রয়োজন হয়। শীতশেষে যখন কয়েকদিন আবহাওয়ার ঠিক থাকে না, রাজমোহন

লেপ ও কাঁথা দুই-ই নিয়ে শোয়। অর্থাৎ, রাত্রে কাঁথা ও ভোরে লেপ। এতটা বয়স হয়ে গেল আজো নিজের পেনে নিজে কালি ভরা তার অভ্যাস হল না, ব্রাশে পেস্ট তাকে নিজে লাগিয়ে নিতে হয়। এমনি রাজমোহন। মশারি খাটাতে গিয়ে বা নিজে দাড়ি কামাতে বসে তার অন্তর-আত্মা হায় হায় করে ওঠে, তার অস্তিত্ব প্রতিবারেই অতি বিপদজনকভাবে টলে যেতে দেখেছি। বছর ঘুরতে চলল সে আর দাড়ি কাটে না। দাড়ি কাটা সে ছেড়ে দিয়েছে। এই যে মশারি, যা আজকাল সে নিজেই খাটিয়ে নিচ্ছিল, এই মশারি খাটানো নিয়ে বহু ব্যাপার আমার জানা আছে। এ নিয়ে একটা স্বতন্ত্র রচনা হয়। উদাহরণস্বরূপ একটা বলি? এই যে মশারি, এর ৪টে দড়ির প্রত্যেকটিতে ঠিক জায়গায় একটা করে গিঁট দেওয়া আছে। রাজমোহন মশারির আঙটায় স্রেফ দড়ি গলিয়ে দেয়, তারপর গিঁট অব্দি পৌঁছে দাও চোখ বুজে ফাঁস। মশারির সঠিক উচ্চতা নিয়ে প্রতিদিন উৎপীড়িত হওয়ার হাত থেকে এ-ভাবেই সে নিজেকে চিরতরে মুক্তি দিয়েছে। এ রাজমোহনেরই বুদ্ধি। গত বছরে মাত্র একবার মাইনের দিন স্ট্যাম্প নিয়ে যেতে সে ভুলে যায়। দেখলুম ব্যস্ত হল না। ইতিউতি চেষ্টা করল না। কাজ করে গেল। পরে বাথরুম যাবার পথে সে দেখল একটা বেঞ্চে একঝাঁক বেয়ারা বসে আছে। তা জনপনেরো হবে। দাঁড়িয়ে পড়ে সে ঐ একঝাঁক-বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল, "স্ট্যাম্প আছে নাকি?" ২।১ জন বলল, "না।" কেউ, "হ্যাঁ" বলল না। দ্বারিক বেশি চেনা, "দ্বারিক তোমার কাছেও নেই বলো কী হে", বলে সে হাসল। একসঙ্গে অন্তত ১৫-জন লোকের কাছ থেকে খবর পাওয়া, আলাদা-আলাদা করে জিজ্ঞেস করার পরিশ্রম বাঁচানো, এও রাজমোহনের বুদ্ধি। সে কুঁড়ে, এইজন্যেই বাধ্যত বুদ্ধিমান। প্রায় ৩৬-বছর এভাবেই তো কাবার করে আনল, হিশেবমত প্রায় আধাআধি মেরে এনেছে—নয় কী? অলস অথচ বোকা, এ হলে আর এ্যাদ্দিন

টিকতে হত না। তো, এই হচ্ছে রাজমোহন। অন্তত এই হচ্ছে তার একটা দিক, কিম্বা কে জানে তার ৩৬-বছরের জীবনের এই-ই ফলাফল। রমার দাদার সঙ্গে সে পারবে কেন, পারে কখনো! তাই ধন্যবাদ রাজমোহনকে যে সে রমার দাদাকে, "সমস্যা কী," এটা জিজ্ঞেস করতে দেয়নি। বস্তুত সে কোনো কথাই বলতে দেয় নি তাঁকে যা আরো ক্রেডিটেবল। সে যা জানিয়েছে তা হল শেষ, বা উপসংহাব। শেষ থেকে সুরু হয় কি? সত্যতই, রাজমোহনের দিক থেকে অন্তত. তার ও রমার মধ্যে আর-কোনো সমস্যা নেই। কেননা, সমস্যা কী? •যার একটা-না-একটা সমাধান আছে তাই-ই সমস্যা। রমার দাদা পারেন সমস্যামাত্রেরই সমাধান করে দিতে যদি তা প্রতীয়মান হয়। রাজমোহন তাই ভালো করেছে গড়গড় করে শুধু উপসংহারটুকু বলে গিয়ে, যা সমস্যা নয়। আমি রাজমোহনকে জানি। তাই বলছি।

সে অপর কোনো মহিলার সঙ্গে প্রেম করে না এটা মেজদাকে খুলে বলেনি বলে কোনো ভুল করেছে রাজমোহন. এ-রকম আমি মনে করি না। কারণ আর অফিসফেরৎ গলা একবারও পরিষ্কার করার প্রয়োজন না বোধ করে, ঈষৎ ঝুঁকে এমন অহংহারা গলায় কথাগুলো সে বলে যায় যে গোটাটা শোনাচ্ছিল স্বীকারোক্তির মত সরল, এতে ভুল-বোঝাবুঝির কোনো সুযোগ থাকতে পারে না। সত্যি অদ্ভুত শোনাচ্ছিল তার গলা। ঠিক, অবিকল, রাজমোহনের গলার মত শুনতে লাগছিল।

যাই হোক; এখন ঐ ঘুমুচ্ছে রাজমোহন। পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে তার ৭-বছরের বউ ও ৬-বছরের মেয়ে। আজ তার মশারিতে একটাও মশা নেই। আজ বাড়ি ফিরে, তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে, সে চলে গিয়েছিল অদূরে—লেভেলক্রশিং-এর ওপারে। সম্পূর্ণ অচেনা সেলুনে

সহসা ঢুকে শান্ত ও নিস্তব্ধভাবে সে কামিয়ে নিয়েছে তার শেষ কয়েক-মাসের সর্বনাশা দাড়ি। ইদানীং দ্রুত পাকতে শুরু করেছিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ঘুমে ইতিমধ্যেই ফুলে উঠেছে তার পরিতৃপ্ত ও চকচকে মুখ। না-জানি কাল ঘুম-জাগা গম্ভীর 'টেরিটিবাজার' তার গলায় কত জমকালো শোনাবে। জানি না কাল কখন উঠবে রাজমোহন। কীভাবে উঠবে। তবে কাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে আর বাড়ি ফিরবে না। শুধু, যদি রমা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করে, ডীডটা করার জন্যে মাঝে মেজদার সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করবে।

কনগ্র্যাচুলেশানস্, রাজমোহন রায়চৌধুরী। সাবাশ!

অধুনা-র অন্য বই

'আজকের গল্প

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাঃ) ঃ সংকলন ঃ আট টাকা

নানাদিক দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা!…চলতিকালের তরুণদের ভাবনা-চিন্তা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি দলিল– দেশ

প্রত্যেকটি গল্পই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সোচ্চারই শুধু নয়, কোন-না-কোন দিক থেকে মনের উপর দাগ রেখে যায়—বসুমতী

অপেক্ষাকৃত অনামীদের সংগে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সম্পাদক একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন—অমৃত

আনকোরা লেখকরা কে কেমন লিখেছেন, পাঠকরা তার বিচার করবেন—আনন্দবাজার পত্রিকা

গল্প-কাররা গল্প-বলার ওপর ততটা জোর দেননি যতটা জোর দিয়েছেন পাত্রপাত্রীদের মানসিক ও সামাজিক পরিবেশকে প্রতিবিম্বিত করার ব্যাপারে—যুগান্তর